মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার বন্ধু রাশেদ



১.

রাশেদ যেদিন প্রথম স্কুলে এসেছিল সেটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাত্র ক্লাস শুরু হয়েছে, স্যার রোল কল করার জন্য খাতা খুলছেন ঠিক তখন দেখলাম একটা ছেলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার বাম হাতে একটা কাগজ, সেটা ভিজে চুপচুপে, সাবধানে সে কাগজটা ধরে রেখে ক্লাসের ভিতরে উঁকি দিতে থাকে। দেখে মনে হয় তার ছাগলের বাচ্চাটাচ্চা কিছু একটা হারিয়ে গেছে, সেটা খুঁজে দেখছে ক্লাসের ভিতরে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি একটা ভেবে শেষ পর্যন্ত সে ক্লাসে ঢুকে পড়ল। মজিদ স্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, এ্যাই, তুই কে রে? কি চাস?

সে কোন উত্তর না দিয়ে ভিজে কাগজটা স্যারের টেবিলে রেখে হাতটা প্যান্টে মুছে ফেলল। স্যার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি এটা?

কাগজ।

কাগজ তো দেখতেই পাচ্ছি। কি কাগজ?

জানি না। ছেলেটা উদাসমুখে সারা ক্লাসটাকে এক নজর দেখে বলল, অফিস থেকে দিয়েছে।

স্যার ভিজে কাগজটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, ভর্তির কাগজ? তুই এই ক্লাসে ভর্তি হবি?

ছেলেটা আবার উদাসমুখে বলল, জানি না।

জানিস না মানে? স্যার ধমক দিয়ে বললেন, কাগজটা ভিজল কেমন করে?

নালায় পড়ে গিয়েছিল।

নালায়? স্যার ভুরু কুঁচকে হাত সরিয়ে নিলেন।

ময়লা নেই স্যার— ধুয়ে এনেছি।

ধুয়ে এনেছিস? স্যার চোখ গোল করে ছেলেটার দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নাম কি তোর?

লাড্ডু।

লাড্ডু?

শুনে আমরা পুরো ক্লাস হো হো করে হেসে উঠলাম। স্যার একটা রামধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর। এক্কেবারে চুপ! আমরা চুপ করতেই মজিদ স্যার আবার ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল নাম কি?

ভাল নাম নাই।

ভাল নাম নাই?

না।

তোর নাম শুধু লাড্ডু?

ছেলেটা মাথা নাড়ল।

তার আগেও কিছু নাই পিছেও কিছু নাই?

নাহ্।

স্যার আবার খানিকক্ষণ অবাক হয়ে লাড্ডুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, শুধু লাড্ডু কখনো কারো নাম হয়?

লাড্ডু চিন্তিতমুখে বলল, না।

তাহলে?

লাড্ডুর সাথে আর কিছু লাগিয়ে দেন তাহলে।

আর কিছু লাগিয়ে দেব?

জ্বী।

কি লাগাব? মুহম্মদ? লাড্ডু মুহম্মদ?

ঠিক আছে। ছেলেটা রাজি হয়ে গেল।

স্যার খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ভীষণ রেগে টেবিলে থাবা দিয়ে বললেন, কভি নেহী। আমার ক্লাসে কারো ভাল নাম লাড্ডু মুহম্মদ চলবে না। তোর বাবাকে গিয়ে বলবি একটা ভাল নাম দিতে।

ছেলেটা মাথা চুলকে বলল, লাভ নাই স্যার।

কেন লাভ নেই?

বাবা নাম দিবে না।

কেন দিবে না?

বড় আলসে। তা ছাড়া একটু পাগল কিসিমের। আমার এক ভাই আছে, তাকেও পুরা নাম দেয়নি।

কি নাম তার?

চমচম।

আমরা সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠতেই স্যার আবার একটা রামধমক দিলেন, চুপ, এক্কেবারে চুপ! না হয় মাথা ভেঙে ফেলব।

আমরা চুপ করার পর স্যার ছেলেটার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তোর মা—

আমার মা নাই।

ও। স্যার হঠাৎ চুপ করে গেলেন। খানিকক্ষণ আঙুল দিয়ে টেবিলে শব্দ করলেন, তারপর বললেন, তাহলে আমি তোকে একটা ভাল নাম দিয়ে দিব?

ছেলেটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, দেন স্যার।

মজিদ স্যার খানিকক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, তোর বাবাকে গিয়ে বলবি কাল তোর নতুন নাম দেয়া হবে।

ঠিক আছে।

স্যার তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল তোরা সবাই একটা করে সুন্দর নাম লিখে আনবি। মনে থাকবে তো?

আমরা মাথা নাড়লাম, মনে থাকবে।

স্যার চলে যাবার পর আমরা সবাই ছেলেটাকে বাজিয়ে দেখতে গেলাম। যখনই ক্লাসে নতুন ছেলে আসে তাকে সব সময় বাজিয়ে দেখতে হয়। কে জানে হয়তো এমন একজন ভাল ছাত্র আসবে যে সব সাবজেক্টে একশতে নব্বই-পঁচানব্বই পেয়ে আমাদের জীবন নষ্ট করে দেবে— আশরাফ যেরকম করেছে। কিংবা কে জানে হয়তো বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কোন কারণে তাকে ধোলাই দিলে তার বাবা পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের ধরিয়ে নিয়ে যাবে— মাসুমের বাবা যেরকম করেছিল। কিংবা কে জানে হয়তো এমন বদমাশ বের হবে যে আমাদের সবার জান একেবারে ভাজা ভাজা করে খেয়ে ফেলবে— কাদের যেরকম করেছে। আগে থেকে কিছু বলা যায় না। তাই ছেলেটাকে সবসময় বাজিয়ে দেখা দরকার।

আমি ছেলেটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবি?

ছেলেটা মুখ বাঁকা করে বলল, মাথা খারাপ হয়েছে তোর?

কি হবি তাহলে?

ফেল করব। সব সাবজেক্টে ফেল।

সব সাবজেক্টে?

হ্যাঁ।

দিলীপ চিন্তিতমুখে বলল, কেমন করে জানিস আগে থেকে?

না জানার কি আছে? স্কুলে এলাম কেন আমি?

ফেল করার জন্যে?

হ্যাঁ। দুই বছর পর পর ফেল করলে আর পড়াশোনা করতে হবে না। বাবা বলেছে।

ফজলু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, কখনো পড়াশোনা করতে হবে না?

না!

আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালাম। ফজলুর চোখ হিংসায় ছোট ছোট হয়ে এল, বলল, ফেল করলে তোর বাবা তোকে বানাবে না?

ছেলেটা খিকখিক করে হেসে বলল, আমার বাবা কখনো বানায় না। পাগল কিসিমের মানুষ তো!

কি করে?

গল্পগুজব করে। আলাপ-আলোচনা করে।

তোর সাথে?

হুঁ।

কি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে?

বেশির ভাগ রাজনৈতিক আলোচনা।

রাজনৈতিক আলোচনা! আমরা একেবারে হা হয়ে গেলাম। বলে কি এই ছেলে! তার বাবা তার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করে!

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুই রাজনৈতিক আলোচনা বুঝিস?

বুঝব না কেন? না বোঝার কি আছে!

আমরা সবাই আবার ভাল করে ছেলেটাকে দেখলাম। মাথায় লালচে এলোমেলো চুল, শার্টের সবগুলি বোতাম নেই, একটি সিফটিপিন দিয়ে আঁটকানো। নীল রংয়ের প্যান্ট, খালি পা। শ্যামলা রং, ভাবুক চোখ। দেখে যে কেউ ভাববে সাধারণ একটা ছেলে, কিন্তু সে মোটেও সাধারণ না। তার মা নেই, বাবা তার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করে। শুধু তাই নয়, তার কোন ভাল নাম নেই— আমার কেউ স্বীকার করলাম না কিন্তু আমাদের সবার ভিতরে একটা হিংসার জন্ম হল।

পরদিন আমরা সবাই একটা করে নাম লিখে এনেছি। ক্লাস শুরু হওয়ার পর মজিদ স্যার ভাল এবং সুন্দর নামের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটা বড় লেকচার দিলেন। স্যার লেকচার দিতে বড় ভালবাসেন। তারপর ছেলেটাকে ডেকে সামনে দাঁড়া করালেন, তাকে নিয়ে এত বড় একটা ব্যাপারে মনে হল সে একটু লজ্জা পাচ্ছিল। স্যার বললেন, এখন তোরা একজন একজন করে নামটা পড়বি। তখন অন্য সবাই সেই নামে ভোট দিবি। যে নামে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়বে সেই নামটা দেয়া হবে।

আমরা তখন একে একে নাম পড়তে শুরু করলাম, অন্য সবাই হাত তুলে ভোট দিতে লাগল, এবং আশরাফ একটা কাগজে নাম এবং ভোটের সংখ্যা লিখে রাখতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর বোঝা গেল নাম দেওয়ার এই পদ্ধতিটি কাজ করার সম্ভাবনা কম। তার কারণ সবচেয়ে বেশি ভোট পেল যে দুটি নাম তার একটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যটি কাজী নজরুল ইসলাম। স্যারকে তখন নতুন আইন জারি করতে হল যে, কোন বিখ্যাত মানুষের নাম দেয়া যাবে না। তখন যে নামটি বেশি ভোট পেয়ে গেল সেটা হচ্ছে রবার্ট ব্রাউন। তখন স্যারকে আবার নতুন আইন জারি করতে

হল— বিদেশী নাম দেওয়া যাবে না। ফজলু সব সময় একটু গোয়ার গোছের, বিদেশী নাম দেয়া হলে ক্ষতি কি সে এটা নিয়ে স্যারের সাথে একটা তর্ক শুরু করে দিল! শুধু তাই নয়, লাড্ডু নামের ছেলেটাও লাজুক মুখে জানাল তার বিদেশী নামে কোন আপত্তি নেই!

স্যার তখন কেন দেশী নাম হতে হবে সেটা বোঝানোর জন্যে দেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এই সব বড় বড় জিনিস নিয়ে একটা লেকচার দিয়ে ফেললেন, স্যার লেকচার দিতে বড় ভালবাসেন। লেকচার শেষ করে বললেন, এখন তোদের আর ভোট দিতে হবে না, নামগুলি পড়, আমার যেটা ভাল লাগবে সেটাই আমি বেছে নেব।

আমরা সবাই লিখে আনা নামগুলি বললাম, স্যার যেগুলি পছন্দ হল সেগুলি একটা কাগজে লিখে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। প্রথম নামটি আলী জাকারিয়া।

স্যার খানিকক্ষণ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, উঁহু। জাকারিয়া নাম হতে হলে মুখ একটু লম্বা হতে হয়। তোর মুখ গোল। তোকে এই নামে মানাবে না।

দুই নম্বর নামটি বের হল— কায়সার আহমেদ। স্যার আবার মাথা নাড়লেন, বললেন, কায়সারদের চুল কোকড়া হতে হয়। তোর চুল কোকড়া নয়। চুল আচড়াস না বলে পাখির বাসার মত হয়ে আছে কিন্তু তোর চুল কোকড়া না। এই নাম চলবে না।

পরের নামটি বের হল হাসান ফেরদৌস। স্যারের নামটা বেশ পছন্দ হল, প্রায় দিয়েই দিচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত পাল্টালেন, বললেন, ফেরদৌস নামটার জন্যে গায়ের রং ফর্সা হতে হয়।

আমাদের ক্লাসে আরেকজন ফেরদৌস আলী আছে। তার গায়ের রং কুচকুচে কাল কিন্তু তবু স্যার রাজি হলেন না। পরের নামটি পড়লেন ঃ রাশেদ হাসান।

এই নামটা স্যারের খুব পছন্দ হল। কয়েকবার নানারকম গলার স্বর করে নামটা পড়লেন, তারপর বললেন, এই নামটা ভাল। নামের মাঝে একটা চরিত্র আছে, কি বলিস?

নামের আবার চরিত্র হয় কি করে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না, সবাই মাথা নাড়লাম। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কে দিয়েছে এই নাম?

আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক ছেলে রঞ্জু উঠে দাঁড়াল। স্যার বললেন, ভেরী গুড নেম! কোথায় পেলি এই নাম?

রঞ্জু শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, আমার ছোট মামা এই নাম দিয়ে কবিতা লেখেন। . . .

ছদ্মনাম এটা?

জ্বী।

আসল নাম কি?

গজনফর মিয়া।

স্যার মাথা নাড়লেন, বললেন, কবি গজনফর মিয়া থেকে কবি রাশেদ হাসান

অনেক ভাল শোনায়। তোর মামা ঠিকই করেছে। নে, বস।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। মজিদ স্যার এবারে ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন। সে কাছে এসে দাঁড়ালে স্যার দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আজ উনিশ শ সত্তুর সালের সেপ্টেম্বর মাসের এগারো তারিখ আমি মজিদ সরকার, ক্লাস সেভেন সেকশন বি-এর ক্লাশ টিচার সবার পছন্দ থেকে বেছে তোর নাম দিলাম রাশেদ হাসান।

আমাদের কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সবাই তখন একসাথে চিৎকার করে আনন্দের মত একটা শব্দ করলাম। স্যার তখন আরো খুশি হয়ে উঠলেন, মাথা নেড়ে বললেন, এখন আমি তোকে ডাকব, তুই জবাব দিবি, ঠিক আছে?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। স্যার ডাকলেন, রাশেদ হাসান।

জ্বী।

ভেরী গুড। স্যার এবারে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি তোরা আর কেউ কোনদিন রাশেদ হাসানকে লাড্ডু বলে ডাকিস তোদের মাথা ভেঙে ফেলব। এখন থেকে এর নাম রাশেদ।

ফজলু দুর্বলভাবে একটু চেষ্টা করল, কিন্তু স্যার তার এতদিনের নাম—

হোক এতদিনের নাম। আজ থেকে রাশেদ। নতুন একটা নাম দেয়া হয়েছে, সেটা পাকা হবে না? কেউ লাড্ডু ডাকবি না, ঠিক আছে?

আমরা খুব অনিচ্ছার সাথে মাথা নাড়লাম।

স্যার চলে যাবার সাথে সাথে ফজলু রাশেদের কাছে গিয়ে বলল, আমি কিন্তু তোকে রাশেদ-ফাসেদ ডাকতে পারব না। ওই সব নাম আমার মুখে আসে না।

আমিও মাথা নাড়লাম। বললাম, লাড্ডুই ভাল। তোর চেহারার মাঝেই একটা লাড্ডু লাড্ডু ভাব আছে। আমিও লাড্ডুই ডাকব।

রাশেদ দাঁত বের করে হেসে বলল, তোদের যা ইচ্ছা!

ক্লাস কেপ্টেন আশরাফ মৃদু স্বরে বলল, বলে দেব স্যারকে আমি। বলে দেব কিন্তু।

দে বলে, ফজলু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরে এল।

রাশেদের নিজের যখন লাড্ডু নামে আপত্তি নেই তখন ক্লাস কেপ্টেন স্যারকে বলে দিলেই কি আর না দিলেই কি! তাছাড়া ক্লাস কেপ্টেন আশরাফ চোখ-মুখ লাল করে অনেক হম্বিতম্বি করে ঠিকই কিন্তু কখনোও অন্য ক্লাস কেপ্টেনদের মত স্যারদের কাছে নালিশ করে না। আশরাফের মনটা ভাল আছে, একটা শুধু সমস্যা—পড়াশোনায় অতিরিক্ত ভাল। চোখ বন্ধ করে প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যায়। শুধু যে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয় তাই না, কথাও বলে শুদ্ধ ভাষায়, কাপড়ও পরে পরিস্কার, এমন কি চুল পর্যন্ত সব সময় আচড়ানো থাকে। দেখলেই বোঝা যায়, কেমন জানি ভাল ছেলে ভাল ছেলে।

রাশেদের অবিশ্যি সেরকম কোন সমস্যা নেই। মনে হয় আমাদের বন্ধু হয়ে যাবে

বেশ তাড়াতাড়ি।

২.

রাশেদ যে মহা মিচকে শয়তান সেটা আমরা বেশ তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করলাম। তাকে আমার লাড্ডু বলেই ডাকব ঠিক করেছি, সেও কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু আসলেই যখন তাকে লাড্ডু বলে ডাকি ব্যাটা কোন উত্তর দেয় না, ভান করে থাকে যেন শুনতে পায়নি। যতক্ষণ রাশেদ বলে না ডাকছি সে না শোনার ভান করে উদাসমুখে বসে থাকে। রাশেদ বলে ডাকামাত্র মুখে হাসি ফুটিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, আমাকে ডাকছিস? ব্যাটার ন্যাকামো দেখে মরে যাই!

আমি আর ফজলু খুব রেগে-মেগে ঠিক করলাম, যত চেষ্টাই করুক আমরা তাকে লাড্ডু বলেই ডেকে যাব, কিছুতেই রাশেদ ডাকব না। কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই আমরা দুজনেই বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম, সবার সাথে সাথে আমি আর ফজলুও তাকে রাশেদ বলে ডাকছি।

শেষ পর্যন্ত আমরাও হাল ছেড়ে দিলাম। রাশেদ হাসান নামটা তার সত্যিই পছন্দ, এই নামে ডাকলে সে যখন এত খুশি হয়, না হয় ডাকলামই তার নতুন নাম দিয়ে।

কয়দিনের মাঝে আমরা টের পেলাম, রাশেদ ছেলেটা আর দশটা ছেলের মত না। সে মোটেও বেশি কথা বলে না, কিন্তু তাই বলে বোকা না। সে ঘোষণা করেছে, পর পর দুই বছর ফেল করে পড়াশোনার ঝামেলা চুকিয়ে দেবে, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ হবে বলে মনে হয় না। অন্য কোন সাবজেক্টে ঝামেলা না হলেও মনে হয় ইংরেজিতে পাশ করে যাবে। এইটুকু ছেলে এরকম কঠিন ইংরেজি শিখল কি করে সেটা প্রথম প্রথম আমাদের কাছে একটা রহস্য ছিল। সাধারণত আমাদের মাঝে যারা বড় লোকের ভদ্রঘরের ছেলে তারা ইংরেজি কমিক-টমিক পড়ে ভাল ইংরেজি শিখে। রাশেদকে দেখে মনে হয় না সেরকম ছেলে, তার বাবা কাঠমিস্ত্রী না হয় ইলেকট্রিশিয়ান, মোটেও ইংরেজি-জানা বড়লোক না। রাশেদ নিজেই একদিন কারণটা বলল— তার বাবা ইংরেজি জানে না বলে মাঝেমাঝেই ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ে তাকে বোঝাতে হয়। একটা ডিকশনারি নিয়ে বসে বানান করে পড়তে পড়তে সে ইংরেজি শিখে গেছে। আজকাল সে চোখ বুজে "বাক স্বাধীনতা" বা "অর্থনৈতিক শোষণ" এরকম কঠিন কঠিন জিনিস ইংরেজিতে বলে ফেলতে পারে।

রাশেদের আরো কিছু অবাক ব্যাপার আছে। তাকে যা ইচ্ছা তাই বলা যায়, সে কিছুতেই রাগ হয় না। সে প্রথম যেদিন এসেছিল সেদিনই ফজলু তাকে নিয়ে কবিতা বানাল—

আব্বুকা লাড্ডু
পরীক্ষায় গাড্ডু
একদম ফাড্ডু

সাংঘাতিক কবিতা সেরকম বলা যায় না। কিন্তু যার নাম লাড্ডু তার কানের কাছে যদি এই কবিতা তিরিশ সেকেন্ড পর পর বলা হয়, তার মেজাজ খারাপ হবার কথা। কিন্তু রাশেদের বেলায় সেটা সত্যি হল না। প্রত্যেকবার ফজলু এই কবিতাটি বলল আর রাশেদ শুনে হেসে কুটিকুটি হয়ে গেল, যেন এর থেকে মজার আর কোন ব্যাপার পৃথিবীতে থাকতে পারে না। ফজলু এক সকালে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। একজন মানুষ যদি না রাগে তাকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে সময় নষ্ট করে কি লাভ?

রাশেদকে যা খুশি বলা যায় কিন্তু তার গায়ে হাত দেয়া যায় না। ফাজলেমি করে একটু-আধটু সে সহ্য করে কিন্তু রাগারাগি করে তাকে একটা ধাক্কা দিলেও সে ঘুরে এসে ডবল জোরে ধাক্কা দিয়ে তার উত্তর দেয়। আমাদের সাথে তো করেই— একদিন কাদেরের সাথে করে ফেলল। কাদের হচ্ছে আমাদের ক্লাস-গুণ্ডা। ফেল করে করে আমাদের ক্লাসে এসেছে। তার মনে হয় এখন কলেজে-টলেজে পড়ার কথা। সে হচ্ছে আমাদের ক্লাসের একমাত্র ছেলে যে গঙ্গা নাপিতের দোকানে দাড়ি কামিয়ে আসে। শুধু যে দাড়ি কামায় তাই নয়, বগলও কামিয়ে আসে। আমরা কখনো কাদেরকে ঘাটাই না, মাঝে মাঝে সে পিছন থেকে আমাদের মাথায় চাটি মেরে কিছু একটা গালাগালি দেয়, আমরা চুপ করে সহ্য করে যাই। একদিন খামোখা সে রাশেদের বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই ফাড্ডুর বাচ্চা, কিলিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলব।

রাশেদ সাথে সাথে কাদেরকে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, আমার নাম ফাড্ডু না।

কাদের চিন্তাও করতে পারেনি এই ক্লাসে কেউ তার গায়ে হাত দেবে, সে মোটেও এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ করে ধাক্কা খেয়ে তাল হারিয়ে একটা বেঞ্চিতে লেগে একেবারে হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত লাগল তার বুঝতে কি হচ্ছে। যখন বুঝতে পারল তখন রাগে ক্ষ্যাপা শুওরের মত চোখ লাল করে ওঠে এল। রাশেদকে একেবারে ছিড়েই ফেলত কিন্তু ঠিক তখন অংক স্যার এসে গেলেন বলে কিছু করতে পারল না।

টিফিনের ছুটিতে কাদের রাশেদকে জানালার নিচে চেপে ধরে বলল, এই ফাড্ডুর বাচ্চা—

আমার নাম ফাড্ডু না।

আমার সাথে রংবাজি? চাকু মেরে ভুঁড়ি ফাসিয়ে দেব।

রাশেদ সেই অবস্থায় হেসে বলে, দে না দেখি।

কাদের এটাকে তাকে অপমান করার চেষ্টা হিসেবে ধরে নিয়ে হাতের উল্টো পিঠ

দিয়ে একটা চড় মারে। ব্যথা দেওয়ার থেকে অপমান করার চেষ্টা বেশি।

সাথে সাথে স্প্রীংয়ের মত রাশেদের পা উঠে যায়। বিদ্যুৎগতিতে সে এত জোরে কাদেরের তলপেটে লাথি মারে যে কাদের নাক চেপে বসে পড়ে।

এরকম অবস্থায় পালিয়ে যেতে হয় কিন্তু রাশেদ পালানোর কোন চেষ্টা করল না বরং কাদেরের কাছে দাঁড়িয়ে বড় মানুষদের মত উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বলল, মারপিট করা ঠিক না। মারপিট করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না—

কাদেরের জন্যে এটাই বাকি ছিল। চিৎকার করে উঠে সে বাঘের মত রাশেদের উপর লাফিয়ে পড়ল। কাদের রাশেদ থেকে অন্তত একমাথা উঁচু, ওজন সম্ভবত দুই গুণ, বয়স অন্তত দেড়গুণ। কাদেরকে এখনই বাজারে গুণ্ডা হিসেবে চালানো যায়, তার তুলনায় রাশেদ একেবারে বাচ্চা একটা ছেলে। দেখে মনে হয়, কাদেরের সাথে রাশেদের মারপিটের কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু মারপিটে গায়ের জোরটা বড় ব্যাপার না। বড় ব্যাপার হচ্ছে সাহস। রাশেদের সাহসের কোন অভাব নেই, মনে হয় তার ভিতরে ভয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কাদের ইচ্ছে করলে তাকে যে পিষে ফেলতে পারে সে ব্যাপারটা সে জানে না। প্রত্যেকবার ঘুসি খেয়ে সে ফিরে পাল্টা ঘুসি মারছিল। বেকায়দা দুই-একটা এমন মোক্ষম লাথি হাঁকলো যে কাদেরকে পিছিয়ে যেতে হল। কিন্তু রাশেদ এমন মার খেল যে সেটা বলার মত নয়।

স্কুলে ছোটখাট খামচাখামচি প্রায়ই হয় কিন্তু বড় ধরনের মারপিট খুব বেশি হয় না। যখন বড় ধরনের মারপিট শুরু হয়, আমরা নিজেরাই ছুটিয়ে দেবার চেষ্টা করি। খুব খারাপ অবস্থা হলে স্যারদের ডাকতে হয়। আজকেও আরেকটু হলে স্যারদের ডাকতে হত কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত টেনে কাদের আর রাশেদকে আলাদা করে দিতে পারলাম। কাদেরকে বেশ কয়েকজন মিলে ধরে রাখতে হচ্ছিল, রাগে সে ফোঁসফোঁস করছে ক্ষ্যাপা মোষের মত। রাশেদের কথা ভিন্ন, রক্তমাখা খানিকটা থুতু ফেলে কিছুই হয়নি এরকম শান্ত স্বরে বলল, মারপিট করা ঠিক না। আর করতেই যদি হয় সমান সমান মিলে মারপিট করতে হয়। তোর হাতির মত সাইজ, মারপিট করার ইচ্ছা করলে আরেকজন হাতির মত সাইজ খুঁজে বের করে তার সাথে করবি। আমার সাথে করিস না। লজ্জার ব্যাপার।

আমরা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা হয়তো স্যারদের কানে যাবে না, কিন্তু হেড স্যারের কানে চলে গেল। হেড স্যার দপ্তরী দিয়ে ডেকে পাঠালেন দুজনকে। আমরা বাইরে ঘুর ঘুর করে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম ভিতরে কি হচ্ছে।

হেড স্যারের দুইটা বেত, একটা নাকি ইণ্ডিয়া থেকে আনা হয়েছে, সেটার নাম 'শিলং ইস্পিশাল', আরেকটা এসেছে গারো পাহাড় থেকে, সেটার নাম 'গারো ইস্পিশাল'। স্কুলের দপ্তরী কালিপদ নাকি প্রত্যেক শুক্রবার বেতগুলিতে তিশির তেল মাখিয়ে রাখে। কেউ মারপিট করলে হেড স্যার প্রথমে দুজনকেই শিলং ইস্পিশাল দিয়ে এক চোট ধোলাই দিয়ে দেন। তারপর দুজনের কথা শুনেন, যে দোষী সাব্যস্ত হয় তাকে

গারো ইস্পিশাল দেওয়া হয়। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম, কাদের আজ ডাবল ডোজ গারো ইস্পিশাল পাবে কিন্তু দেখা গেল কাদের বেশ হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে হেড স্যারের রুম থেকে বের হয়ে এল। তাকে গারো ইস্পিশাল দেওয়া হয়নি। হেডস্যারের রুমে রাশেদ কিছুতেই মুখ খুলতে রাজি হয়নি। মুখ ফুটে একবার সত্যি কথাটা বললেই কাদেরের বারটা বেজে যেতো। কাদেরকে স্কুলের সবাই চিনে, হেড স্যার মনে হয় ওঁৎ পেতে থাকেন তাকে ধোলাই দিতে।

বিকেলের দিকে রাশেদের মুখ এবং চোখ বেশ খারাপভাবে ফুলে গেল। হাত দিয়ে টিপে-টুপে আমাকে বলল, এ্যাই ইবু, দেখে কি বোঝা যাচ্ছে?

হ্যাঁ।

বেশি কি বোঝা যাচ্ছে?

হ্যাঁ।

এ্যাহ্! খুব খারাপ হল ব্যাপারটা। খুব খারাপ হল।

কি খারাপ হল?

এই যে নাক-মুখ এইভাবে ফুলে গেল!

বেকুবের মতো মারপিট করবি আর মুখ ফুলবে না? তোকে বাসায় আবার বানাবে?

না-না। বাসায় বানাবে কেন?

তাহলে?

রাশেদ খানিকক্ষণ মুখ সূচালো করে থেকে বলল, কাদেরের না কোন ঝামেলা হয়!

কাদেরের? কাদেরের কি ঝামেলা হবে?

কাচু ভাইয়ের যা মাথা গরম!

কাচু ভাই? সেটা কে?

আমাদের পাড়ায় থাকেন। ছত্রিশ ইঞ্চি সিনা। এন-এস-এফের গুণ্ডারা একবার পেটে চাকু মেরেছিল, চাকু পেটে ঢুকে নাই, পিছলে গেছে। সকালে চারটা করে কাচা ডিম খান।

তোর সাথে খাতির আছে?

এক পাড়ায় থাকেন, খাতির থাকবে না? আমাকে খুব মায়া করেন, রাজনীতির খবর দেই তো।

রাশেদ খুব চিন্তিতমুখে বসে থাকে দেখে আমিই ভয় পেয়ে যাই।

পরদিন কাদের স্কুলে এল না। কাদের খুব নিয়মিত স্কুলে আসে না, তাই সেটা নিয়ে কারো খুব মাথাব্যথা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু রাশেদকে খুব চিন্তিত দেখাল। কাদের তার পরদিনও স্কুলে এল না, রাশেদকে তখন আরো বেশি চিন্তিত দেখাল। আমরা তখন আরো বেশি ভয় পেয়ে গেলাম। রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হল

কাদেরের?

জানি না।

তোর কাচু ভাইকে জিজ্ঞেস করিসনি?

করেছি। কিছু তো বলে না।

তোর কি মনে হয়? জানে মেরে ফেলেছে?

রাশেদ হেসে উড়িয়ে না দিয়ে মুখটা আরো গম্ভীর করে বলল, কিছুই তো জানি না। কাচু ভাইয়ের যা মাথা গরম!

তুই কি তোর কাচু ভাইকে কাদেরের কথা বলেছিলি?

বলতে চাই নাই, কিন্তু জোর করলেন— রাশেদ মুখ সূঁচালো করে বসে থাকে।

ফজলু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, সত্যি মার্ডার করে ফেলেছেন?

রাশেদ উত্তর না দিয়ে খুব হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে।

আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কি সর্বনাশা কথা! রাশেদকে পিটিয়েছে বলে কাদেরকে মার্ডার করে ফেলেছে? আমরা গুটিশুটি মেরে বসে থাকি, ক্লাসে মন দিতে পারি না। যখন থানা পুলিশ হবে তখন কি সবাইকে বলতে হবে না? কেমন করে মার্ডার হল কাদের? ডেডবডি কোথায় ফেলেছেন রাশেদের কাচু ভাই, যিনি সকালে চারটা করে কাঁচা ডিম খান।

পরদিন অবশ্যি কাদের ক্লাসে হাজির হল। প্রথমে আমরা তাকে চিনতে পারলাম না। কাদেরের মাথায় ছিল ফ্যাসনের চুল। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতো গভীর মনোযোগ দিয়ে। চুলের গোছা তার কপালের উপর ঝাউগাছের মত উঁচু হয়ে থাকত। কাদেরের মাথায় সেই চুলের চিহ্ন নেই, পুরো মাথা ন্যাড়া চকচকে বেলের মত। দেখে আমরা একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। কাদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলবে সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

ফজলু চোখ কপালে তুলে বলল— তোর চুল?

কাদের মেঘের মত স্বরে বলল, চুপ শালা।

ফজলু আর কিছু বলার সাহস পেল না। আমি গলা নামিয়ে বললাম, আমরা ভেবেছিলাম তুই মার্ডার হয়ে গেছিস।

কাদের আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, একটা কথা বললে তোকে মার্ডার করে দেব।

দিলীপ বলল, মাথা ন্যাড়া করেছিস কেন? তোর বাবা ভাল আছেন তো?

চুপ শালা মালাউন।

রাশেদ বলল, তোর কপাল ভাল, শুধু চুলের উপর দিয়ে গেছে। কাচু ভাইয়ের যা মাথা গরম!

কাদের কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। যারা জোঁককে ভয় পায় তাদের পায়ে জোঁক কামড়ে ধরলে তারা যেভাবে জোঁকের দিকে তাকায় ঠিক সেভাবে সে রাশেদের

দিকে তাকাল। চোখের মাঝে একই সাথে ভয় আর ঘেন্না! তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাশেদকে তার আর স্পর্শ করারও ইচ্ছে নেই।

কাদের এর পর আর কোনদিন রাশেদকে কিংবা আমাদেরকেও উৎপাত করেনি।

৩.

বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুল ছুটি হয়ে গেলে আমি রাশেদকে বললাম, আমাদের পাড়ায় যাবি?

কি আছে তোদের পাড়ায়?

আমরা আছি।

আমরা কারা?

আমি, ফজলু, দীলিপ। আশরাফও আছে।

ফজলু মনে করিয়ে দিল, কাদেরও আছে।

আমি হি হি করে হেসে বললাম, কাদের আর কোন দিন তোর ধারে-কাছে আসবে না!

রাশেদ মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যাবি আমাদের সাথে?

তোরা কি করিস?

খেলি।

কি খেলিস?

ডাকাতি ডাকাতি খেলি। একটা কারখানা আছে, সেটাতেও খেলি।

কারখানা? কিসের কারখানা?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, এখনো ঠিক করি নাই, গাড়ির কারখানা না হয় ওষুধের কারখানা। এখন অবিশ্যি খালি বিস্কুটের।

রাশেদ চোখ বড় বড় করে বলল, তোরা বিস্কুট বানাতে পারিস? কি দিয়ে বানাস? মিছিমিছি বিস্কুট?

না না, সত্যি বিস্কুট।

দিলীপ ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, বিস্কুট না কচু! আটার মাঝে চিনি মিশিয়ে চুলার মাঝে গরম করলেই যেন বিস্কুট হয়।

আমি বললাম, একবারেই সব হবে নাকি? আস্তে আস্তে হবে।

দিলীপ আবার মুখ বাঁকা করে বলল, মিষ্টি রুটির মত খেতে, হ্যাক থুঃ!

ফজলু একাই সবগুলি বিস্কুট খেয়ে ফেলেছিল, দিলীপের কথা শুনে গরম হয়ে বলল, হ্যাক থুঃ মানে? খেয়ে দেখেছিস?

রুটির মত নরম লুতা লুতা। ময়লা কাল—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, খাবার সোডা দিতে হবে পরের বার। খাবার সোডা দিলে মুচমুচে হয়।

ফজলু বলল, আটা না দিয়ে ময়দা দিতে হবে। তাহলে দেখতে ভাল হবে।

দিলীপ তখনো মুখ কুঁচকে রেখেছে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কেরোসিনের গন্ধ —

ফজলু মহা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই চুপ কর দেখি। সব কাজে শুধু সমালোচনা।

দিলীপের এত সমালোচনার পরও রাশেদকে বিস্কুটের কারখানায় খুব উৎসাহী দেখা গেল। বলল, ভাল করে যদি সত্যি সত্যি বিস্কুট বানাতে পারিস অনেক কাজ দেবে। তাই না?

কি কাজ দেবে?

দেশের সব গরিব বাচ্চাদের সকালে নাস্তা খাওয়ানোর জন্যে দেয়া যাবে।

আমাদের তখন মনে পড়ল, রাশেদ রাজনৈতিক মানুষ। সে সব সময়ই দেশের সব মানুষের কথা ভাবে। আমরাও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লাম, তা ঠিক।

ফজলু পর্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে আগে ওষুধের কারখানা তৈরি করতে হবে। দেশের মানুষের দরকার ওষুধ। বিস্কুট না খেলে কি হয়? কিন্তু অসুখ হলে ওষুধ খেতেই হয়।

দিলীপ আবার ঠোঁট উল্টে বলল, তোরা ওষুধ বানাবি? তোরা?

কেন, অসুবিধা কি?

কিসের ওষুধ?

জ্বর, সর্দি আর কাশি। সাথে মাথাব্যথা।

ফজলু যোগ করল, এবং পেটের অসুখ।

কেমন করে বানাবি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, কেন, শফিক ভাইকে জিজ্ঞেস করব। শফিক ভাই বলে দেবে।

দিলীপ চুপ করে গেল। শফিক ভাই পারেন না এমন কোন কাজ নেই। চুপ না করে উপায় কি? শফিক ভাই আমাদের পাড়ায় থাকেন। কলেজে পড়েন, আই. এস. সি. না যেন বি. এস. সি ঠিক মনে থাকে না। যখনই আমাদের কিছু দরকার হয় আমরা শফিক ভাইয়ের কাছে যাই। শফিক ভাই সব কিছুর একটা ব্যবস্থা করে দেন। আমাদের পাড়ায় আমরা যখন নাটক করলাম, শফিক ভাই আমাদের মুখোশ তৈরি করে দিয়েছিলেন (ইশঃ সে যে কি দারুণ একটা নাটক হয়েছিল!)। যখন আমরা সার্কাসের দল খুলেছিলাম তখন শফিক ভাই আমাদের বিড়ালটাকে রং করে বাঘ তৈরি করে দিয়েছিলেন (একেবারে খাঁটি বাঘ, শুধু যদি মিয়াও করে না ডাকত!)। আমরা যখন ল্যাবরেটরী তৈরি করেছিলাম তখন শফিক ভাই লিটমাস পেপার আর চুম্বক এনে দিয়েছিলেন (কত যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরা করেছিলাম!)।

দিলীপ বলল, চল যাই শফিক ভাইয়ের কাছে।

চল।

আমরা হেঁটে হেঁটে শফিক ভাইয়ের বাসার দিকে রওনা দিলাম।

শফিক ভাই তাঁদের বাসার দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে অরু আপার সাথে গল্প করছিলেন। অরু আপা এখানকার মেয়েদের কলেজে পড়েন, আই. এ. না কি বি. এ. আমার মনে থাকে না। অরু আপা শফিক ভাইদের পাশের বাসায় থাকেন। আগেও দেখেছি দুজনে খুব গল্প করতে পছন্দ করেন। আমাদের দেখে অরু আপা চোখ বড় বড় করে বললেন, ও মা! আমাদের হারু পার্টি দেখি এখানে।

আমরা না শোনার ভান করে হেঁটে গেলাম। গতবার আমরা যখন ফুটবলের টিম খুলেছিলাম, অরু আপা রাত জেগে আমাদের টিমের জন্যে জার্সি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সব জায়গায় গোল খেয়ে আমাদের হারু পার্টি নাম হয়ে গিয়েছিল বলে আজকাল আর ফুটবল খেলি না। অরু আপা আমাদের দেখলেই সেটা মনে করিয়ে দেন। আবার ডাকলেন পিছন থেকে, গোল খাওয়ায় ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হতে আর কত দেরি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, ইয়ারকি মেরো না অরু আপা।

ইয়ারকি মারলাম কখন? এত কষ্ট করে জার্সি তৈরি করে দিলাম, সেটা পরে খেলতে গিয়ে শুধু গোল খেয়ে এসেছিস। কোনদিন কি একটা গোল দিয়েছিস কোথাও? দিয়েছিস?

শফিক ভাই আমাদের বাঁচালেন, বললেন, কেন জ্বালাচ্ছ ওদের অরু? গোল দেয় নাই তো দেবে, পরের খেলায় দেবে। অন্য টিম যদি এত ফাউল করে খেলে এদের দোষ কি?

আমরা জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। শফিক ভাই আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি খবর তোমাদের? কই যাও?

আপনার কাছে এসেছিলাম।

ফজলু যোগ করল, একটা বিশেষ কাজে।

দিলীপ অরু আপার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, একটা বিশেষ গোপন কাজে।

অরু আপা চোখ পাকিয়ে বললেন, তার মানে তোরা আমার সামনে বলবি না?

আমরা মাথা নাড়লাম, না।

শফিক ভাই বললেন, আস তাহলে আমার ঘরে।

আমরা শফিক ভাইয়ের পিছু পিছু তাদের বাসায় যাচ্ছিলাম। অরু আপা পিছন থেকে বললেন, এর পরের বার যদি হারু পার্টির জার্সির জন্যে আমার কাছে আসিস, মাথা ভেঙে দেব।

কাজটা ভাল হল না কিন্তু কি আর করা যাবে!

শফিক ভাই তাঁর চাচার বাসায় থাকেন। ঠিক আপন চাচা নয়, দূর সম্পর্কের চাচা। বাসার বাইরের দিকে একটা ছোট ঘর শফিক ভাই ঠিকঠাক করে নিয়েছেন। আমরা তাঁর ঘরে গিয়ে দেশের উন্নতির জন্যে একটা ওষুধের কারখানা খোলার কথাটা খুলে বললাম। শফিক ভাই খুব গম্ভীর হয়ে শুনলেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি অরু আপা থাকলে এতক্ষণে এটা নিয়ে হাসি–তামাশা করে একটা কাণ্ড করতেন।

ফজলু বলল, শফিক ভাই ওষুধ কেমন করে বানাতে হয় আপনাকে বলে দিতে হবে।

একশ বার। শফিক ভাই মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু আমি তো আগে কখনো ওষুধ তৈরি করিনি। আগে কিছু বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে।

তাহলে করেন।

করব। করে যখন বের করব তখন তোমাদের বলব। কি রকম ওষুধ বানাতে চাও? হোমিওপ্যাথিক না এলোপ্যাথিক?

আমি মাথা চুলকালাম, কোনটা ভাল?

ফজলু বলল, হোমিওপ্যাথিকটা খেতে ভাল।

দিলীপ বলল, কিন্তু এলোপ্যাথিক বেশি কাজের।

তাহলে এলোপ্যাথিকই হোক।

শফিক ভাই জিজ্ঞেস করলেন, টেবলেট না ক্যাপসুল?

আমরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকালাম। দিলীপ জিজ্ঞেস করল, কোনটা সোজা?

মনে হয় টেবলেট।

তাহলে টেবলেট দিয়েই শুরু করি।

ঠিক আছে।

শফিক ভাইয়ের সাথে খুটিনাটি জিনিস নিয়ে আরো খানিকক্ষণ কথা বলে আমরা যখন চলে আসছিলাম, হঠাৎ শফিক ভাই বললেন, দেশের অবস্থা খুব খারাপ সেটা জান?

আমরা কিছু বলার আগেই রাশেদ বলল, জানি।

কি জান?

ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ বন্ধ করে দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান বাঙালীদের ক্ষমতায় যেতে দেবে না।

শফিক ভাই একটু অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকালেন, আমরাও তাকালাম। রাশেদ একেবারে বড় মানুষের মত কথা বলছে। শফিক ভাই বললেন, তুমি কেমন করে জান বাঙালীদের ক্ষমতায় যেতে দেবে না?

পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের শোষণ করে বেঁচে থাকে। আমরা ক্ষমতায় গেলে আর শোষণ করতে পারবে না।

শফিক ভাই এবারে মনে হল আরো অবাক হলেন। বললেন, তোমাকে তো আগে দেখিনি।

আমি বললাম, নতুন এসেছে আমাদের ক্লাসে।

কি নাম তোমার?

রাশেদ হাসান!

আমি বললাম, তার আগের নাম ছিল লাড্ডু।

লাড্ডু?

রাশেদ একটু হেসে বলল, এখন আমার নাম রাশেদ।

রাশেদ, তুমি তো বেশ খবরাখবর রাখ দেখি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, রাশেদ সব সময় তার বাবার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করে।

শফিক ভাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, শেখ মুজিবকে যদি ক্ষমতা না দেয় তাহলে কি হবে বলে তোমার মনে হয়?

গৃহযুদ্ধ।

ফজলু হি হি করে হেসে বলল, গৃহযুদ্ধ আবার কি? ঘরের মাঝে যুদ্ধ? বাবার সাথে মায়ের?

দূর বোকা— শফিক ভাই বললেন, একটা দেশের নিজেদের ভিতরে যখন যুদ্ধ হয় তাকে বলে গৃহযুদ্ধ। পূর্ব পাকিস্তান যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে সেটা হবে গৃহযুদ্ধ।

দিলীপ ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি হবে গৃহযুদ্ধ?

শফিক ভাই আস্তে আস্তে বললেন, আমার মনে হয় হবে। আমার মনে হয়, পশ্চিম পাকিস্তান কখনো শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দেবে না— যদিও শেখ মুজিব বেশি সিট পেয়েছেন তবু তাঁকে ক্ষমতা দেবে না— কারণ তাহলে আর ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে না। কিন্তু বাঙালীরা আর কখনো সেটা চুপ করে মেনে নেবে না। কিছুতেই নেবে না।

কি করবে?

আন্দোলন করবে। আসলে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। অসহযোগ আন্দোলন। দোয়া কর যেন আন্দোলনে কাজ হয়। যেন এমনিতেই ক্ষমতা দিয়ে দেয়।

রাশেদ মাথা নাড়ল, বলল, দেবে না। কিছুতেই দেবে না।

আমরা শফিক ভাইয়ের ঘর থেকে বের হয়ে এলাম খুব গম্ভীর হয়ে। দেশের সামনে এত বড় একটা বিপদ, তার মাঝে তো আর হাসাহাসি করতে পারি না। আমরা হেঁটে হেঁটে আমাদের বাসার কাছে চলে এলাম। বাসার সামনে দেয়ালে চুন বালি খসে

পড়েছে। দেয়ালের ফোকড়ে পা দিয়ে উপরে উঠে পা ঝুলিয়ে বসে থাকলাম গম্ভীর হয়ে। বসে বসে আমরা দেশের কথা ভাবছিলাম, তখন দেখি আশরাফ তার ক্রিকেট বল আর ব্যাট নিয়ে এসেছে। আশে-পাশের বাসা থেকে আরো ছেলেপিলেরা বের হয়ে এল। আমরা তখন মাঠে ক্রিকেট খেলতে শুরু করলাম, দেশের বিপদের কথা ভুলে গেলাম একটু পরেই।

বিকেল পড়ে এলে রাশেদ বলল সে এখন যাবে। ক্রিকেট খেলায় রাশেদ একেবারে যাচ্ছেতাই। না পারে বোলিং, না পারে ব্যাটিং। শুধু তাই না, ফিল্ডিংয়ের সময়ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে সেই জানে, হাতের কাছ দিয়ে বল গড়িয়ে যায়, ধরতে মনে থাকে না।

আমি রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর বাসা কোথায়?

অনেক দূর। ব্রীজের কাছে।

তাহলে চলে যা। বাসায় যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে যাবে।

বাসায় যেতে দেরি আছে আমার।

কোথায় যাবি?

মশাল মিছিল আছে রাত্রিবেলা।

তুই মশাল মিছিলে যাবি?

হ্যাঁ। ছোট বলে হাতে মশাল দিতে চায় না। আগে গিয়ে অনেক সাধাসাধি করতে হবে।

ফজলু চোখ ছোট ছোট করে বলল, ইশ! আমি যদি তোর সাথে যেতে পারতাম!

রাশেদ বলল, চল যদি যেতে চাস।

ফজলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দিলীপ বলল, ফজলু যাবে মশাল মিছিলে? তাহলেই হয়েছে! কাকা তোকে পিটিয়ে লম্বা করে দেবে না?

ফজলু বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল। আশরাফ গম্ভীর গলায় বলল, বড় না হওয়া পর্যন্ত মিছিলে যোগ দেয়া ঠিক না। রাজনৈতিক দল ভুলপথে নিয়ে যাবে।

রাশেদ আবার বড় মানুষের মত বলল, পথে তো নামতে হবে আগে, না হলে জানবি কেমন করে কোন্‌টা ভুলপথ কোন্‌টা ঠিক পথ?

রাশেদ যাবার আগে তার স্কুলের বই-খাতা আমাকে দিয়ে গেল কালকে স্কুলে নিয়ে যাবার জন্যে। আশরাফ তার ব্যাট আর বল নিয়ে বাসায় গেল, দিলীপ আর ফজলুও চলে গেল তাদের বাসায়, অন্যেরা আগেই চলে গিয়েছে। আমি খানিকক্ষণ একা একা মাঠে বসে থেকে বাসার দিকে রওনা দিলাম। শফিক ভাইয়ের ঘর অন্ধকার, তার মানে বাসায় নেই। কে জানে রাশেদের মত মশাল মিছিলে গিয়েছে কি না। অরু আপাদের বাসায় দেখি বারান্দায় অরু আপা আর তার আম্মা দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আমাকে দেখে অরু আপা গলা উঁচিয়ে বললেন, এই ইবু, এখন বই-খাতা নিয়ে কোথায়

যাস?

আমার বই-খাতা না।

কার?

রাশেদের। মশাল মিছিলে গেল, তাই আমাকে দিয়েছে।

এইটুকুন পিচ্চি মশাল মিছিলে গেল? হ্যাঁ, বলে কি?

হ্যাঁ।

বাসায় গেলে তার বাবা বানাবে না?

না। রাশেদ আর তার বাবা খুব বন্ধু!

মজা তো দেখি! এরকম বাবা হলে খারাপ হয় না, কি বলিস?

রাশেদ বলেছে, তার বাবা নাকি একটু পাগল কিসিমের।

একটু কি বলছিস? মনে তো হয় পুরোটাই, না হলে এইটুকু পিচ্চিকে রাত্রিবেলা মশাল মিছিলে পাঠায়?

আমি চলে যাচ্ছিলাম, অরু আপা আবার ডাকলেন, এই ইবু, আয়, লজেন্স খাবি?

লজেন্সের কথা শুনে আমি একটু নরম হয়ে গেলাম। অরু আপা মানুষটা খারাপ না কিন্তু মাথায় মনে হয় একটু ছিট আছে। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই আমার হাতে কয়েকটা লজেন্স ধরিয়ে দিয়ে বললেন, খেয়ে দ্যাখ, অনেক মজা।

অরু আপার আম্মা বললেন, তোমার আম্মা ভাল আছেন, ইবু?

জ্বী খালাম্মা।

আসতে বল একদিন। আমি ঘর থেকে বের হবার সময় পাই না।

বলব খালাম্মা।

অরু আপা বললেন, এই ইবু, তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, ঠিক জবাব দিবি?

আমি ঘামতে শুরু করলাম, এই বুঝি আবার অরু আপার পাগলামি শুরু হল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি?

আমাকে তোর পছন্দ হয়?

আমি ঢোক গিলে বললাম, হয়।

আমাকে বিয়ে করবি?

যাও! খালি ঠাট্টা।

ঠাট্টা কখন করলাম, সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করছি। করবি? আমি তোর জন্যে ভাত রান্না করে দেব। তুই যখন বুড়ো হবি তোর মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দেব। করবি?

যাও!

অরু আপার আম্মা বললেন, কেন জ্বালাচ্ছিস ছেলেটাকে?

কে বলল জ্বালাচ্ছি! তোমার জামাই, মা দেখ পছন্দ হয় কি না। তুমি মাছের মাথা

রান্না করে খাওয়াবে। ইবু, তুই মাছের মাথা খাস তো?

যাও অরু আপা, তোমার খালি ঠাট্টা!

দেখিস, আমি তোর অনেক যত্ন করব। প্রত্যেকদিন লজেন্স নিয়ে আসব। করবি বিয়ে?

অরু আপার আম্মা হাসি চেপে বললেন, কেন জ্বালাচ্ছিস ইবুকে! ছেড়ে দে, এখন সন্ধে হয়ে যাচ্ছে।

খালাম্মা ভিতরে চলে যাবার পর অরু আপা মনে হল আরো মজা পেয়ে গেলেন। আমার মুখের কাছে মাথা নামিয়ে বললেন, দেখ না— আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ। আমার চেহারা কি খারাপ?

খারাপ কেন হবে?

তাহলে রাজি হচ্ছিস না কেন?

তুমি আমাকে বিয়ে করবে না কচু!

কেন করব না?

তুমি কত বড় আমি কত ছোট! তাছাড়া—

তাছাড়া কি?

তাছাড়া তুমি কাকে বিয়ে করবে সেটা আমি জানি।

কাকে?

শফিক ভাইকে।

অরু আপা চমকে উঠে এদিকে সেদিকে তাকালেন তারপর আমার চুলের মুঠি ধরে বললেন, কাউকে যদি বলেছিস একেবারে মাথা ভেঙে ফেলব।

ঠিক আছে বলব না। কিন্তু ঠিক বলেছি কি না?

চুপ! চুপ দুষ্টু পাজী ছেলে।

আমি দাঁত বের করে হাসলাম। এতদিনে অরু আপাকে শায়েস্তা করার মত একটা জিনিস পাওয়া গেছে।

রাত্রিবেলা আমাদের বাসার খুব কাছে দিয়ে মশাল মিছিল গেল। হাজার হাজার মানুষ, মশাল হাতে তাদের কেমন জানি রহস্যময় দেখায়। আমি রাশেদকে অনেক খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না, এত ভিড়ের মাঝে পাওয়ার কথাও না।

মিছিলটা চলে যাবার পরও শ্লোগানগুলি আমার কানে বাজতে লাগল। অনেকগুলি শ্লোগান দিয়েছে, তার মাঝে একটা খুব সুন্দর ছিল, "আমার দেশ তোমার দেশ— বাংলাদেশ বাংলাদেশ!" খারাপ হয় না ব্যাপারটা। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যদি আমাদের দেশটার নাম বাংলাদেশ হয়ে যায়! কি সুন্দর নাম, বাংলাদেশ! একেবারে নিজের একটা দেশ।

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম, বাংলাদেশ হয়ে গেছে, আর আমরা সবাই

আনন্দে চিৎকার করতে করতে যাচ্ছি— চিৎকার করতে করতে যাচ্ছি!

৪.

মার্চ মাসের মাঝামাঝি রাশেদ একদিন স্বাধীন বাংলার একটা পতাকা নিয়ে এল। গাঢ় সবুজ রংয়ের একটা পতাকা, মাঝখানে লাল গোল, তার মাঝখানে হলুদ রংয়ের কি একটা, দেখে বুঝতে পরলাম না।

ফজলু জিজ্ঞেস করল, মাঝখানে হলুদ এটা কি রে? পাখির মত।

ধুর বোকা— রাশেদ হেসে বলল, পাখি কেন হবে? এটা স্বাধীন বাংলার ম্যাপ।

আমরা আবার ভাল করে তাকালাম, রাশেদ বলে দেয়ার পর এবারে মাঝখানের অংশটা সত্যি ম্যাপের মত দেখাতে লাগল।

রাশেদ বলল, যে ম্যাপটা তৈরি করেছে সে ভাল করে ম্যাপটা তৈরি করতে পারেনি। আসলে সোনালী রং দিয়ে তৈরি করার কথা ছিল। সোনার বাংলা তো!

আমরা অবাক হয়ে ফ্ল্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দারুণ হয়েছে ফ্ল্যাগটা। আমাদের হাতে নিয়ে আমাদের এক রকম রোমঞ্চ হল। আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাগ! আমি রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় পেলি এই ফ্ল্যাগ?

রাশেদ উত্তর না দিয়ে রহস্যময় ভঙ্গি করে হেসে বলল, হুঁ হুঁ আমার কাছে সবই আছে!

এটাই হবে আমাদের স্বাধীন বাংলার ফ্ল্যাগ?

হ্যাঁ।

আমরা অবাক বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে দেখি। বিশ্বাসই হতে চায় না যে আমরা স্বাধীন বাংলা হয়ে যাব। আমাদের নিজেদের আলাদা একটা ফ্ল্যাগ হয়ে যাবে। উর্দু ক্লাসে আর "এক কুত্তা মাটি ম্যা ল্যাটা হায়" সুর করে পড়তে হবে না।

তখন খুব উত্তেজনা চারিদিকে। অসহযোগ আন্দোলন হচ্ছে। সেটা কি জিনিস প্রথমে বুঝতে পারিনি। রাশেদ বুঝিয়ে দিল।

মার্চ মাসের তিন তারিখ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। ইয়াহিয়া খান এক তারিখে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়া খানের গলায় গলায় ভাব। সে যেটাই বলছে সেটাই হচ্ছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করার কথা। এখন আর হবে না। শেখ মুজিব এখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, পাকিস্তান সরকারের আর সহযোগিতা করা হবে না, তাই এর নাম অসহযোগ আন্দোলন। দেশ এখন চলছে শেখ মুজিবের কথায়।

উত্তেজনায় আমাদের মুখে কথা সরে না। জিজ্ঞেস করলাম, তাই হচ্ছে সারা দেশে?

হ্যাঁ।

বঙ্গবন্ধু এখন দেখছেন—

বঙ্গবন্ধু? সেটা আবার কে?

রাশেদ আবার এক গাল হেসে বলল, তোরা দেখি কোন খবরই রাখিস না। শেখ মুজিবকে এখন সবাই ডাকে বঙ্গবন্ধু।

আমরা কয়েকবার কথাটা উচ্চারণ করলাম, কথাটা একটু ভারিকটু, কিন্তু বেশ লাগে শুনতে।

বঙ্গবন্ধু কি দেখছেন?

দেখছেন ইয়াহিয়া খান কি করে। যদি দেখেন ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা দেয়ার কোন ইচ্ছা নাই, লাথি মেরে দূর করে দেবেন। আমরা স্বাধীন বাংলা হয়ে যাব সাথে সাথে।

আমি আগে কখনো কাগজ পড়ি নি। আজকাল খুব মন দিয়ে পড়ি। ঢাকা থেকে আমাদের ছোট শহরটাতে খবরের কাগজ আসতে একদিন লেগে যায়, তবুও খবরগুলি গরম থাকে। ঢাকায় মনে হচ্ছে প্রত্যেকদিনই মিছিল হচ্ছে, গোলাগুলীও হচ্ছে। একজন দুজন মানুষ মনে হয় রোজই মারা যাচ্ছে গুলী খেয়ে। আমরা আশা করে আছি— আর কয়েকদিন, তারপরই বঙ্গবন্ধু লাথি মেরে পাকিস্তানীদের বের করে দেবেন, আর আমরা স্বাধীন বাংলা হয়ে যাব।

এর মাঝে রাশেদ একদিন একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এল। পাকিস্তানের মিলিটারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খন বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছে, সাথে এনেছে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে। তারা নাকি বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশ আবার শুরু করতে পারে, সেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে।

সর্বনাশ! ফজলু মুখ কাল করে বলল, তাহলে স্বাধীন বাংলা হবে না?

রাশেদ গম্ভীর হয়ে বলল, যদি ক্ষমতা সত্যি দিয়ে দেয় তাহলে কেমন করে হবে?

স্বাধীন বাংলার এত সুন্দর ফ্ল্যাগটা—

রাশেদ মাথা চুলকে বলল, কিন্তু শালারা খুব হারামির বাচ্চা। মনে নাই নভেম্বর মাসে ঝড়ের সময় কি করল?

কি করল?

ঝড়ে কয়েক লাখ লোক মারা গেল, আর শালার ব্যাটা ইয়াহিয়া খান একবার দেখতে পর্যন্ত এল না। চীন থেকে ঘুরে এসে নিজের দেশে চলে গেল।

তাই নাকি?

তারপরই তো মাওলানা ভাসানী এক ধমক দিলেন ইয়াহিয়া খানকে। মনে নাই?

আমরা এই ব্যাপারটা জানতাম না, তবু কয়েকবার মাথা নাড়লাম।

রাশেদ গম্ভীর গলায় বলল, মাওলানা ভাসানী ঠিকই বলেছেন।

কি বলেছেন?

বলেছেন কারো ছয় দফা, কারো কারো এগারো দফা। আমার হচ্ছে এক দফা। এই দেশ স্বাধীন বাংলা হবে।

ফজলুর চোখ চকচক করে ওঠে, হাতে কিল দিতে বলল, তাহলে আর স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

কেন?

জানিস না মাওলানা ভাসানীর পোষা জীন আছে?

জীন?

হ্যাঁ। ফজলু মাথা নেড়ে বলল, তারা সব খবর এনে দেয়।

কিসের খবর?

ভবিষ্যতে কি হবে তার খবর। জীনেরা তো সব জানে আগে থেকে। তারা নিশ্চয়ই মাওলানা ভাসানীকে বলে দিয়েছে— স্বাধীন বাংলা হবে! মাওলানা ভাসানী যেটা বলেন সেটা কখনো ভুল হয় না—

দিলীপ একটু হকচকিয়ে গেল, বলল, জীনটা কি?

জীন চিনিস না? জ্বীন-ভূত শুনিস নি কখনো?

শুনেছি, কিন্তু জীনটা কি রকম হয়?

ফজলু খুব চিন্তা করে বলল, মনে হয় যেইসব ভূত মুসলমান তাদেরকে জীন বলে।

দিলীপ ভয়ে ভয়ে বলল, ভূতদের হিন্দু-মুসলমান আছে?

মনে হয় আছে।

ওদের রায়ট হয়? কাটাকাটি হয়?

ফজলু মাথা চুলকে বলল, নিশ্চয়ই হয়।

ভূতেরা তখন কি মরে?

ফজলুকে এবারে সত্যিই চিন্তিত দেখাল। অনেকক্ষণ ভেবে বলল, কাটাকাটি হলে কি আর মরে না, কিছু নিশ্চয়ই মরে।

মানুষ মরে হয় ভূত। ভূত মরে কি হয়?

ফজলু হঠাৎ খুব রেগে-মেগে বলল, তুই চুপ করবি এখন?

দিলীপের মোটেও চুপ করার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু ঠিক তখন আমরা শ্লোগান শুনতে পেলাম। বিরাট বড় একটা মিছিল আসছে। মিছিলের সামনে বড় স্বাধীন বাংলার পতাকা, সবাই শ্লোগান দিচ্ছে— জয় বাংলা। এই শ্লোগানটা নতুন, আগে কখনো শুনিনি। সব শ্লোগানের দুই অংশ থাকে একজন বলে প্রথম অংশ, অন্য সবাই তখন বলে দ্বিতীয় অংশ। যে রকম "ইয়াহিয়ার চামড়া" "তুলে নেব আমরা" কিংবা "আমার দেশ তোমার দেশ" "বাংলাদেশ বাংলাদেশ"। এই শ্লোগানে কিন্তু একটাই অংশ। একজন বলে জয় বাংলা, তখন অন্য সবাই বলে জয় বাংলা। শ্লোগানটা সাংঘাতিক। বলার সময়ই মনে হয় দেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।

রাশেদের পিছু পিছু আজকে আমরাও মিছিলের সাথে সাথে গেলাম, গলা ফাটিয়ে জয় বাংলা বলে চেঁচালাম। বাজারের কাছে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন রাশেদ থেমে আঙুল দিয়ে আহসান মঞ্জিলের দিকে দেখাল। দেখলাম, দোতলায় জানালার পর্দা একটু ফাঁক করে কে যেন উঁকি মেরে দেখছে।

কে ওটা?

নিশ্চয় আজরফ আলী।

তুই কেমন করে জানিস?

দেখছিস না সামনে দাঁড়িয়ে দেখার সাহস নাই। উঁকি মেরে দেখছে।

কেন সাহস নাই?

এত বড় মিছিল, সাহস হবে কেমন করে? আজরফ আলীর তিন বউ জানিস না?

তিন বউ থাকলে কি হয়?

রাশেদ খুবই বিরক্ত হল। বলল, কিছুই দেখি জানিস না। তিন বউ থাকলে কাঠ মোল্লা হয়। যত কাঠ মোল্লা, জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী সব পাকিস্তানের পক্ষে জানিস না?

ও।

আমরা যখন মিছিলের সাথে সাথে খান বাহাদুরের বাসার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলাম রাশেদ তখন আবার দাঁড়িয়ে গেল।

আমি বললাম, কি দেখছিস?

খান বাহাদুর নিশ্চয়ই লুকিয়ে দেখছে।

কি দেখছে?

মিছিলটাকে। পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলো তো স্বাধীন বাংলা একেবারে সহ্য করতে পারে না। তুই যদি কানের কাছে গিয়ে বলিস 'জয় বাংলা' দেখবি সব চুল আর দাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে রাগে।

আমরা মিছিল থেকে বের হয়ে রাশেদের সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। মিছিলটা যখন চলে গেল তখন দেখলাম, খান বাহাদুর আস্তে আস্তে ভিতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রাশেদ ঠিকই বলেছে, রাগে মুখ থম-থম করছে। মনে হচ্ছে পারলে পুরো মিছিলটাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলেন।

ফজলু বলল, একটা ঢেলা মারব নাকি?

ধুর! ঢেলা মারবি কেন?

আমরা আরো খানিকক্ষণ খান বাহাদুরের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বাসায় ফিরে এলাম।

পরের কয়দিন খুব দুশ্চিন্তায় কাটল। সত্যি সত্যি যদি ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো মিলে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের পুরো ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তো আর স্বাধীন বাংলা হবে না, পাকিস্তানই থেকে যাবে। রাশেদ অবিশ্যি ক্রমাগত বলে যাচ্ছে সেটা

কিছুতেই হতেই পারে না। ইয়াহিয়া খান যত বড় বদমাইশ ভুট্টো নাকি তার থেকে একশগুণ বড় বদমাইশ। পুরোটা নাকি একটা চাল অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, কিছুতেই বাঙালীদের ক্ষমতা দেবে না। আমরা সেটাই আশা করে আছি, মিটিং ভেঙে যাবে আর বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোর পাছায় লাথি মেরে বলবেন, দূর হ তোরা। পাকিস্তানে বসে এখন আঙুল চুষ আজ থেকে আমাদের স্বাধীন বাংলা।

আমাদের ছোট শহরটা অবিশ্যি এর মাঝে স্বাধীন বাংলা হয়ে গেছে। সব দোকানে, সব বাসায় একটা করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। যেখানেই যাই সেখানেই বঙ্গবন্ধুর ছবি। ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম . . ." আমরা সবাই আশা করে আছি, এবারে শুধু একটা ঘোষণা, তারপরই পাকাপাকি স্বাধীন হয়ে যাব আমরা। স্কুলে আর উর্দু পড়তে হবে না।

মার্চ মাসের পঁচিশ তারিখে গভীর রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খুব হৈ-চৈ হচ্ছে চারদিকে, বাসার ভিতরে ছুটোছুটি, বাইরে মাইকে কি যেন বলছে। আমি বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, অন্ধকারে আব্বা আর আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে আব্বা ?

আব্বা কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ?

আব্বা আস্তে আস্তে বললেন, যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বাবা। ঢাকায় মিলিটারীরা আক্রমণ করছে, হাজার হাজার মানুষকে নাকি মেরে ফেলেছে। যুদ্ধ হচ্ছে এখন।

কারা যুদ্ধ করছে বাবা ?

বাঙালীরা। পুলিশ। ই. পি. আর. ছাত্র।

মাইকে একজন লোক খুব উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে কথা বলতে বলতে রিকশা করে যেতে থাকে। সে বলেছে, ভাইসব ! ভাইসব ! সারা দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে নিরস্ত্র বাঙালী জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহ এখন ঢাকায় পথেঘাটে লুটিয়ে পড়ে আছে। বীর পুলিশ বাহিনী এবং ই. পি. আর. তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। সারা দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ . . .

লোকটার কথা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠে সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় ভিড়। আমার বুকের ভিতর কেমন জানি করতে থাকে। ভয়, আতংক, উত্তেজনা আর তার সাথে সাথে কেমন জানি আশ্চর্য একটা আনন্দ।

স্বাধীন বাংলা হবে তাহলে সত্যি !

৫.

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। সকালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল। দেখি সবাই রেডিওর সামনে মুখ কাল করে বসে আছে। রেডিওতে প্রথম ইয়াহিয়া খান বক্তৃতা দিল। ইংরেজিতে বক্তৃতা। কিছু বুঝতে পারলাম না। আব্বা যেভাবে একটু পরে পরে মাথা নাড়তে লাগলেন মনে হল খুব খারাপ জিনিস বলছে। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছে গো?

বলছে সব দোষ শেখ মুজিবের। দেশটাকে ধ্বংস করতে যাচ্ছিল, কোন মতে রক্ষা হয়েছে। তাকে এখন কঠিন শাস্তি দেবে।

শেখ মুজিব এখন কোথায় আছেন?

বলেছে তো এরেস্ট করেছে। সত্যি–মিথ্যা কে জানে।

আম্মা শুকনো মুখে বসে রইলেন। ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতার পর রেডিওতে একজন ঘোষণা দেয়া শুরু করল। শহরে কারফিউ, বাইরে বের হলেই গুলী করা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। রেডিওতে যারা কথা বলে তারা সব সময়ে খুব সুন্দর করে কথা বলে, কিন্তু এই লোকটাকে মনে হল কোন জঙ্গল থেকে ধরে এনেছে, উচ্চারণ এত খারাপ যে শুনলে বমি এসে যায়। আব্বা বিরক্ত হয়ে বললেন, বন্ধ কর তো রেডিওটা। বন্ধ কর।

আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম।

বাইরে এসে দেখি রাস্তায় লোকজন খুব বেশি নেই। যারা আছে তারা সবাই এখানে সেখানে রেডিও নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বি. বি. সি. রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনার চেষ্টা করছে। আমি ইংরেজি বুঝি না, তাই খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দেয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। একটু পর দেখলাম একটা মিছিল এল, অন্যদিন মিছিল যে রকম হেঁটে হেঁটে যায় আজ সে রকম নয়, একেবারে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। এটাকে বোধ হয় বলে জঙ্গী মিছিল। মিছিলের শেষের দিকে কমবয়সী ছেলেরা, তাদের হাতে রাইফেল, কোমরে গুলীর বেল্ট। এত তাড়াতাড়ি এই ছেলেগুলি বন্দুক রাইফেল কোথায় পেল? সত্যি সত্যি তাহলে যুদ্ধ শুরু হবে এখন, যেটাকে গৃহযুদ্ধ বলে? উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপতে থাকে।

সারাটা দিন কেমন করে কাটল টেরই পেলাম না। শুধু গুজব আর গুজব। কি হচ্ছে কেউ জানে না, একেক জন একেকটা গুজব নিয়ে আসে। একবার শুনি প্রচণ্ড যুদ্ধ, পাকিস্তানীরা প্রায় সারেন্ডার করে করে অবস্থা। আরেকবার শুনি ঢাকা শহর পাকিস্তানীরা দখল করে ফেলেছে, শহরে এখন লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা বোঝার কোন উপায় নেই। রেডিওতে কিছু বলে না, আকাশবাণী কোলকাতা থেকে শুধু "আমার সোনার বাংলা" গানটি বাজিয়ে যাচ্ছে আর সব অনুষ্ঠান বন্ধ। মনে হয় বাইরের পৃথিবীও কিছু জানে না।

এভাবে কোন রকমে দিনটা কেটে গেল। রাতে আবার কিছু কিছু গুজব এল। কিছু ভাল কিছু খারাপ। কোনটা বিশ্বাস করা যায় বোঝা যাচ্ছিল না। রাত্রে বি. বি. সি. থেকে একজন বলল ঢাকায় নাকি খুব খারাপ অবস্থা। ছাত্র শিক্ষক সাধারণ মানুষ যাকে পেয়েছে মেরে শেষ করেছে। সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

পরদিন বিকেলবেলা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বিকেলের দিকে হঠাৎ চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন থেকে মেজর জিয়াউর রহমান নামে একজন বলল, বঙ্গবন্ধু ভাল আছেন। তাঁকে নেতা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে। আর কোন ভয় নেই।

শোনামাত্র সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তার মানে পাকিস্তানীরা এক তরফা মারছে না। আমাদের সৈন্যরাও যুদ্ধ করছে। আমরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকি। কে জিতবে যুদ্ধে? কে?

মেজর জিয়াউর রহমান নামের মানুষটার জন্যে গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠল। বারবার সে বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছে। তাহলে পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুকে এরেস্ট করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু নিশ্চয় সবাইকে বলেছে কেমন করে যুদ্ধ করতে হয়। আর ভয় কি আমাদের!

একদিন দুই দিন করে এক সপ্তাহ কেটে গেল। আস্তে আস্তে সব খবর এসে পৌঁছাতে শুরু করেছে। প্রথম খবরটি সবচেয়ে খারাপ খবর, পাকিস্তানীরা আসলেই বঙ্গবন্ধুকে এরেস্ট করে নিয়ে গেছে। অন্য খবরগুলিও ভাল না। ঢাকায় পঁচিশে মার্চের রাতে নাকি হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলেছে। যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেটা কমে এসেছে। ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টো যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ-আলোচনার ভান করছিল আসলে তখন হাজার হাজার পাকিস্তানী সৈন্যকে নিয়ে এসেছে। তারপর খুব ভাবনা-চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় আক্রমণ করেছে। বাঙালী সৈন্যদের কাছে অস্ত্র রাখতে দেয়নি, তাই ঢাকায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ করেছে পুলিশেরা, রাজারবাগে। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ইণ্ডিয়াতে। পৃথিবীর সব দেশ পুরো ব্যাপারটা বেশ কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করছে, কিন্তু কেউ পাকিস্তানীদের থামাতে এগিয়ে আসছে না। পাকিস্তানীরা চোখ বন্ধ করে দুই হাতে শুধু মানুষকে মেরে যাচ্ছে।

প্রথম দিকে আমাদের এই ছোট শহরটায় যে রকম টগবগে একটা উত্তেজনা ছিল এখন সেরকম উত্তেজনা নেই, তার বদলে সবার ভিতরে কেমন একটা ভয় এসে জায়গা নিচ্ছে। স্কুলে মুক্তি বাহিনীর একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছিল, ছেলেরা সেখানে ট্রেনিং নিত। ট্রেনিং সেন্টার উঠে গেল। যাঁরা নেতা ছিলেন, গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাঁদেরকেও দেখা যাচ্ছে না। সবাই নাকি আন্ডারগ্রাউন্ড চলে গেছেন। শহরে কোন পুলিশ নেই। একদিন দিনদুপুরে একটা মস্ত ডাকাতি হয়ে গেল। আমরা বাসায় বসে শুনতে পেলাম প্রচণ্ড গোলাগুলী হচ্ছে। সব মিলিয়ে পুরো শহরটায় কেমন যেন

একটা আতংক আতংক ভাব।

বড় বড় শহরগুলি পাকিস্তানী সৈন্যরা এসে দখল করে নিয়েছে। আমাদের এই ছোট শহরটাতেও এসে যাবে যে কোন দিন। সবাই শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে। আম্মা একদিন আব্বাকে বললেন, শুনেছ, সবাই যে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে?

আব্বা কিছু বললেন না।

আমরাও কি যাব?

আব্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোথায় যাব আমরা?

দেশের বাড়ি?

আব্বা দুর্বলভাবে হেসে বললেন, এখন কি রাস্তাঘাট কিছু আছে, নাকি যাওয়ার কোন উপায় আছে? দেশের কি অবস্থা শুনছ না?

একদিন অনেক রাতে দিলীপের বাবা আমাদের বাসায় এলেন। দিলীপের বাবা আব্বার সাথে একই কলেজে পড়ান, আমরা কাকু বলে ডাকি। দিলীপের বাবা এমনিতে দেখতে খুব সুন্দর, একবার যখন নাটক হয়েছিল সিরাজদ্দৌলার অভিনয় করেছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিই বুঝি একজন রাজা! এখন অবিশ্যি তাঁকে দেখতে কেমন জানি লাগছে। চুল উশকো-খুশকো। মুখে খোচা খোচা দাড়ি, চোখ লাল, মনে হয় কতদিন ঘুমাননি। বাবাকে বললেন, আজীজ, কাল চলে যাচ্ছি।

আব্বা বললেন, সত্যি?

হ্যাঁ, যা খবর পাচ্ছি আর থাকা যায় না।

আব্বা মাথা নাড়লেন। কাকু বললেন, কারো জীবনের আর কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু হিন্দু কিংবা আওয়ামী লীগের কেউ হলে তার আর কোন রক্ষা নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে কেমন করে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নেই?

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে যাবে?

এখান থেকে বাসে করে নদীর ঘাট পর্যন্ত যাব। সেখান থেকে নদী পার হয়ে বাকি পথ হেঁটে।

বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছাতে কতদিন লাগবে?

ঠিক জানি না। এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন।

দশ দিন?

কাকু শুকনো মুখে বললেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে কি যে হবে ভগবানই জানেন!

আব্বা বললেন, তুমি যাও, কে জানে তোমাদের পিছু পিছু হয়তো আমাদেরও আসতে হবে।

কাকু গলা নামিয়ে বললেন, কাউকে বলে যাচ্ছি না। শুধু তোমাকে বললাম। তুমি

যদি পার বাড়িঘরের দিকে একটু চোখ রেখো।

কাকু আব্বা মাথা নেড়ে বললেন, আমি চোখ রাখব? একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, ধরে রাখলাম সব গেছে। প্রাণে বেঁচে থাকলেই আমি খুশি।

কাকু আব্বাকে কি সব কাগজপত্র দিয়ে যাবার সময় বাবাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেন। ভাঙা গলায় বললেন, আমার ছেলেমেয়ের জন্যে একটু প্রার্থনা কর।

করব। তুমি খোদার উপর ভরসা রেখো। খোদা এত বড় অবিচার সহ্য করবে না।

কাকু ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় আব্বা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কাল কখন রওনা দেবে?

ভোরে। খুব ভোরে।

ভেবেছিলাম খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠব। কিন্তু তবু দেরি হয়ে গেল— লাফিয়ে উঠে বসলাম আমি। দিলীপরা কি চলে গেছে এর মধ্যে? আমি বিছানা থেকে নেমে হাত-মুখ না ধুয়েই ছুটলাম ওদের বাসার দিকে। যাবার আগে একবার দেখাও যদি না হয় তাহলে কেমন করে হবে?

গিয়ে দেখি ওরা এখনো চলে যায়নি। তবে সবাই বের হয়েছে, সাবার সামনে দুইটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি চলে যাবে। আমাকে দেখে দিলীপ ছুটে এল, তার চোখ লাল, শার্টের হাতা দিয়ে নাক-মুখ আর চোখ মুছে, বলল, আমরা বাস্তুহারা হয়ে যাচ্ছি।

বাস্তুহারা?

হ্যাঁ, যাদের বাড়িঘর নেই তাদের বাস্তুহারা বলে।

এই তো তোদের ঘরবাড়ি।

একটু পরে আর থাকবে না। রাস্তায় ঘুমাতে হবে। চিড়া খেয়ে থাকতে হবে।

চিড়া?

হ্যাঁ। শুধু চিড়া। দিলীপকে কেমন হতচ্ছাড়ার মত দেখাচ্ছে। হঠাৎ ফ্যাঁসফ্যাস করে আবার কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমি যেতে চাই না। আমি ইণ্ডিয়া যেতে চাই না।

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না, আমার চোখেও হঠাৎ পানি এসে গেল। দিলীপ কোন মতে কান্না থামানোর চেষ্টা করে বলল, যারা হিন্দু তাদের সবাইকে মিলিটারীরা মেরে ফেলছে। আমরা এখন কোথায় থাকব?

আমি বললাম, দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন আর কোন হিন্দু-মুসলমান থাকবে না।

ততদিনে আমরা মরে ভূত হয়ে যাব।

কেন মরবি?

আমরা যে হিন্দু! রাস্তায় যদি আমাদের ধরে তাহলে বলব, আমরা মুসলমান। বাবা আমাদের সবার একটা করে নাম ঠিক করে দিয়েছে। মুসলমান নাম। আমারটা আমি

নিজে ঠিক করেছি।

কি নাম?

রকিবুল হাসান।

আমি দিলীপের দিকে তাকালাম। রকিবুল হাসান আমার ভাল নাম। সবাই ইবু বলে ডাকে, তাই ভাল নামটার কথা মনেই থাকে না, দিলীপের মনে আছে।

দিলীপ হঠাৎ এসে আমাকে ধরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মরতে ইচ্ছা করে না। একেবারে মরতে ইচ্ছা করে না।

মরবি কেন? ছিঃ!

আমি জানি আমরা সবাই মরে যাব। সবাই। সবাইকে মেরে ফেলবে মিলিটারী। আমাদের সবাইকে মেরে তোদেরকেও মেরে ফেলবে। আমার মেশোমশাইকে মেরে ফেলেছে। সঞ্জয়দা ছিল তাকেও মেরে ফেলেছে। আমি জানি আমাদেরকেও মেরে ফেলবে।

দিলীপ হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। দিলীপের বাবা এসে দিলীপের হাত ধরে নিয়ে গেলেন। কাকীমা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে। বুঝতে পারছি না কেন। দিলীপের বোন শিপ্রাদি আজ একটা শাড়ি পরেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন। তারপর কেউ কোন কথা না বলে রিকশায় উঠলেন। তাদের হাতে বেশি কোন জিনিস নেই, ছোটখাট কয়েকটা ব্যাগ। পানির একটা বোতল। দিলীপ একটা বই শক্ত করে ধরে রেখেছে। কি বই এটা?

রাস্তা দিয়ে রিকশাটা চলে যাবার পর হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম কাকীমাকে দেখতে অন্যরকম লাগছে কেন। কাকীমার কপালে কোন সিঁদুর নেই। দেখে যেন কেউ বুঝতে না পারে তারা হিন্দু।

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদব না কাঁদব না করেও কাঁদতে শুরু করলাম। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কিন্তু আমার ঠিক দুঃখ লাগছিল না। আমার কেমন জানি রাগ উঠছিল, ভয়ংকর রাগ। ভয়ংকর ভয়ংকর রাগ।

৬.

আমাদের শহরে মিলিটারী এল এপ্রিল মাসের তিরিশ তারিখে। ততদিন শহর প্রায় খালি হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে মানুষজন বেশি নেই, দোকানপাট বন্ধ। একজন দুজন যারা আছে তাদের চোখে-মুখে কেমন জানি একটা ভয় ভয় ভাব। কেমন একটা সন্দেহ আর এক ধরনের আতংক।

আব্বার চেহারাতেও কেমন জানি দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়ে গেছে। আমি যখন আশে-পাশে থাকি না তখন আম্মার সাথে নিচু গলায় কথা বলেন আর মাথা নাড়েন।

মিলিটারী এলে কি হবে সেটা নিয়ে আব্বার মনে নানারকম দুশ্চিন্তা।

যেদিন মিলিটারী এল সেদিনটাও ছিল ঠিক অন্যদিনের মত। নীল আকাশ, পরিষ্কার একটি দিন, গরম বাতাস, শুকনো ধুলো উড়ছে চারদিকে। বেলা এগারোটার দিকে একটা গুজব ছড়িয়ে গেল মিলিটারীর গানবোট এসে থেমেছে নদীর ঘাটে। হাজার হাজার মিলিটারী নামছে গানবোট থেকে, দৈত্যের মত একেকজনের চেহারা।

আমার একটু দেখার কৌতূহল হচ্ছিল, আব্বা গম্ভীর গলায় বললেন, খবরদার, ঘর থেকে বের হবে না।

আমি তাই ঘর থেকে বের হলাম না, জানালার কাছে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। রাস্তা খালি, কোন মানুষজন নেই। একটা রিকশাও নেই কোথাও।

দুপুরবেলায় দেখলাম খান বাহাদুর দুইজন মানুষ নিয়ে সড়ক ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা রিকশার জন্যে অপেক্ষা করলেন বলে মনে হল কিন্তু আজ রিকশা পাবেন কোথায়? রিকশা না পেয়ে আবার তারা হাঁটতেই শুরু করলেন। দেখে মনে হয় নদীর ঘাটের দিকেই যাচ্ছেন। রাশেদ তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল, একেবারে খাটি পাকিস্তানী দালাল। তবে আমার স্বীকার করতেই হল, খান বাহাদুরের সাহস আছে, দৈত্যের মতন চেহারার পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে দেখা করতে বুকের পাটা লাগে।

খানিকক্ষণ পর হঠাৎ গোলাগুলীর শব্দ শোনা গেল। অনেকদূর থেকে আসছে কিন্তু গোলাগুলীর শব্দ তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেরকম হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল ঠিক সেরকম আবার হঠাৎ করে থেমে গেল। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

আব্বা দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। আমরা ঘরের ভিতর চুপ করে বসে রইলাম। আব্বা পায়চারি করছেন, আম্মা চুপচাপ বসে আছেন, কারো মুখে কোন কথা নেই। আমার পেটের ভিতরে কেমন যেন পাক দিতে থাকে। এক এক মুহূর্ত মনে হয় এক এক ঘণ্টা।

বেলা তিনটার দিকে হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। আব্বা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দেখেন, রাশেদ দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে বললেন, সে কি! তুমি এখানে কি করছ?

রাশেদ ভিতরে ঢুকে বলল, খুব পানির তেষ্টা পেয়েছে।

আমি এক গ্লাস পানি এনে দিলাম। ঢকঢক করে পুরো গ্লাস শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাইরে যা গরম!

আব্বা বললেন, এমন দিনে তুমি বাসা থেকে বের হলে কেন? বাসায় যাও তাড়াতাড়ি।

যাব।

তোমার বাসায় চিন্তা করবে না?

নাহ্।

আব্বা অবাক হয়ে একবার রাশেদের দিকে তাকালেন, আরেকবার আমার দিকে

তাকালেন। রাশেদ খানিকক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মিলিটারীরা খান বাহাদুরকে মেরে ফেলেছে।

আব্বা ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, কি? কি বললে?

রাশেদ নিচের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, মিলিটারীরা খান বাহাদুরকে মেরে ফেলেছে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি দেখেছি।

আব্বা শুনে একেবারে লাফিয়ে উঠে বললেন, তুমি দেখেছ?

রাশেদ মাথা নাড়ল।

কোথায় দেখেছ?

নদীর ঘাটে।

আব্বা খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নদীর ঘাটে কি করতে গিয়েছিলে?

মিলিটারী দেখতে গিয়েছিলাম।

তুমি একা?

হ্যাঁ। সড়কের পাশে একটা নারকেল গাছ আছে, তার পিছনে লুকিয়েছিলাম।

তুমি নিজের চোখে দেখেছ খান বাহাদুরকে মেরে ফেলেছে?

হ্যাঁ। রাশেদ ফ্যাকাসে মুখে একবার আব্বার মুখের দিকে তাকাল, আরেকবার আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর ভয় করেনি?

করেছে।

কেমন করে মেরেছে?

গুলী করে। খান সাহেব দুইজন মানুষকে সাথে নিয়ে হেঁটে আসছিলেন, তখন রাস্তায় দুইটা মিলিটারী তাঁকে থামিয়েছে। খান সাহেবের সাথে কি সব কথাবার্তা বলেছে। তারপর যেই সামনে হেঁটে যেতে চেষ্টা করেছেন মিলিটারী দুইটা বন্দুক তুলে গুলী করতে শুরু করেছে। সাথের দুইজন উল্টো দিকে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করেছে, তখন তাদেরকেও গুলী করে মেরে ফেলেছে।

সাথে সাথে মরে গেছে সবাই?

সেটা জানি না। রাস্তায় তিনজনের লাশ পড়েছিল, মিলিটারীরা পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে এনে ফেলে রেখেছে।

আব্বা ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করলেন, তু–তু–তুমি নিজের চোখে দেখেছ সব?

হ্যাঁ।

এইটুকুন ছেলে, তুমি নিজে এইসব দেখেছ?

রাশেদ আবার মাথা নাড়ল। আমি দেখলাম তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। বলল, আমি কিছুক্ষণ এখানে বসি?

বস।

রাশেদ চুপচাপ বসে রইল। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অন্যরকম। যেন কিছু একটা বুঝতে পারছে না। অনেকক্ষণ বসে থেকে বিকেল বেলা সে চলে গেল।

মিলিটারীরা অনেক সময় নিয়ে নদীর ঘাট থেকে শহরের মাঝে এল। প্রথমে একদল হাতের বন্দুক তাক করে মাথা নিচু করে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসে। খানিকদূর এগিয়ে এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পজিশন নেয়, বন্দুক তাক করে শুয়ে বসে থাকে, তখন আরেক দল এগিয়ে আসে। কাছাকাছি আসার পর আরেকদল গুড়ি মেরে একটু এগিয়ে যায়, তারা পজিশান নেবার পর অন্যেরা আসে। দেখে-শুনে মনে হয় তারা কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না, হঠাৎ করে কেউ যদি আক্রমণ করে বসে তার জন্যে এত রকম ব্যবস্থা। নদীর ঘাট থেকে শহরের মাঝখানে দুই মাইলের মতন, এইটুকু আসতে তাদের দুই ঘণ্টার মত লাগল। এই সময়টাতে ওরা চোখের সামনে যাকে দেখেছে তাকেই মেরে ফেলেছে। শুরু করেছে খান সাহেব আর তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে, তারপর রাস্তায় আরো গোটা দশেক মানুষকে এভাবে মেরেছে। কেউ বাজার করতে যাচ্ছিল, কেউ মিলিটারী দেখে ভয়ে দৌড় দিয়েছিল, কেউ রাস্তায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল, আবার কেউ শুধুমাত্র কৌতূহলী হয়ে গিয়েছিল মিলিটারী দেখার জন্য। মিলিটারীরা কাউকে ছেড়ে দেয়নি।

মিলিটারীরা তাদের ঘাঁটি করল আমাদের স্কুলে। একটা বড় কুৎসিত পাকিস্তানী পতাকা টানিয়ে দিল বদমাইশগুলি।

রাত্রে ছাড়াছাড়াভাবে গোলাগুলি হল। কাকে গুলী করেছে কে জানে। আমরা সারারাত গুটিশুটি মেরে বসে রইলাম।

পরের দিন সকালবেলা আবার রাশেদ এসে হাজির হল। আব্বা অবাক হয়ে বললেন, আবার বের হয়েছ তুমি?

রাশেদ মাথা নাড়ল।

কোন খবর আছে?

জ্বী। আজরফ আলী একটু আগে মিলিটারী ক্যাম্পে গেছে।

আজরফ আলী কে?

পাকিস্তানী দালাল। তিন বউ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিলিটারীরা মেরে ফেলে নাই?

না। সাথে একটা বড় পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ নিয়ে গেছে। মাথায় টুপি পরে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলে চিৎকার করতে করতে গেছে। মিলিটারীরা মারে নাই সেজন্যে।

আমি বললাম, মারা উচিত ছিল।

আব্বা কেমন জানি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

পরের কয়দিন শহরে একটার পর একটা বাসা লুট করা হল, বাসায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। আমরা বাসায় বসে থেকে দেখলাম ধোঁয়া উড়ছে, সাথে মানুষের চিৎকার। ভয় নয় আনন্দের চিৎকার। দিলীপদের বাসা লুট হল বুধবারে। দুপুর বেলা আজরফ আলী দুইজন মিলিটারী নিয়ে এল, সাথে আরো কিছু মানুষ, সবার মাথায় টুপি। আজকাল যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই দেখি টুপি। মিলিটারী দুইজন প্রথমে বাসাটার চারদিকে ঘুরে দেখল তারপর কয়েকবার খামোকা বাসার এখানে-সেখানে ধাক্কা দিল। শেষে সামনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলল। মনে হয় ব্যাটাদের গায়ে মোষের মত জোর।

প্রথমে ভিতরে ঢুকল মিলিটারী দুইজন, পিছু পিছু আজরফ আলী। খানিকক্ষণ ভিতর থেকে ধুমধুম শব্দ হল, মনে হল কিছু একটা ভাঙছে। মিলিটারী দুইজন আর আজরফ আলী বের হয়ে এল একটু পরে। একজনের হাতে দিলীপদের টেপ রেকর্ডার। দিলীপের বাবার খুব গান শোনার শখ ছিল। আরেকজন মিলিটারীর হাতে ছোট একটা বাক্স, বাক্সের ভিতরে কি আছে বোঝা গেল না। আজরফ আলীর হাতে কিছু নেই, বাইরে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে বলল, এই মালাউনের বাচ্চা ইণ্ডিয়া ভেগে গেছে। এর মালসামান এখন গণিমতের মাল। এখন এই মালসামান—

কথা শেষ করার আগেই টুপি-পরা লোকগুলি চিৎকার করে দিলীপদের বাসায় ঢুকে গেল, তাদের বাসার জিনিসপত্র টেনে বের করতে লাগল। একজনকে দেখলাম দেওয়াল ঘড়িটা বগলে নিয়ে ছুটছে। কতবার দিলীপদের বাসায় এই ঘড়িতে সময় দেখেছি! কয়েকজন মিলে দেখলাম দিলীপদের চালভর্তি ড্রামটা টেনে টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় কিছু মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মিলিটারীরা তাদেরকেও ডাকল লুট করার জন্যে। লোকগুলি লুট করতে চাইছিল কি না জানি না কিন্তু কারো না করার সাহস হল না, ভয়ে ভয়ে বাসার ভিতরে ঢুকে গেল। একটু পরে দেখলাম, তারাও মহা উৎসাহে লুট করা শুরু করেছে।

আম্মা জানালার কাছে দিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে আস্তে বললেন, হায় খোদা, তুমি কেমন করে সহ্য করছ? কেমন করে?

সন্ধ্যেবেলা থেকে কারফিউ। রাশেদ এল বিকাল বেলা। আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, খবর আছে কিছু?

জ্বী।

কি খবর?

এম. পি সাহেবের বাসা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এম. পি সাহেব কই?

আন্ডারগ্রাউন্ড। তাকে পায় নাই। জামাইকে পেয়েছে। গুলী করে মেরে ফেলেছে।

ডেডবডি পড়ে আছে এখনো।

ও।

শরীরে যখন গুলী লাগে বুলেটটা ঘুরতে ঘুরতে যায়।

তাই নাকি?

জ্বী। সামনে থাকে একটা ছোট ফুটো— পিছনে বড় গর্ত হয়ে যায়। গুলীটা ঘুরে ঘুরে বের হয়তো, তাই।

আব্বা ঢোক গিলে বললেন, ও।

রাশেদ মাথা নাড়ল। জ্বী, গুলীটা সীসা দিয়ে তৈরি হয়। যখন শরীরে লাগে তখন ফেটে যায়, সীসা তো নরম, তাই।

ও।

মিলিটারী সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত শ'খানেক মানুষ মেরেছে। ধরেছে আরো শ'খানেক—

ও।

যাদের ধরেছে তাদেরকেও মারবে।

তুমি কেমন করে জান?

সবাইকে একটা কোদাল দিয়ে মাটি কাটতে দিয়েছে। যার কবর সে নিজে কাটবে। কাটা হলে পাশে দাঁড়িয়ে গুলী।

তুমি কেমন করে জান?

দেখেছি। স্কুলের পাশে জংলা মতন জায়গা আছে, সেখান থেকে দেখা যায়।

আব্বা অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোর ভয় করে না?

করে। রাতে ঘুমাতে পারি না।

তাহলে?

রাশেদ চুপ করে বসে রইল। আব্বা নরম গলায় বললেন, বাসায় যাও রাশেদ, একটু পরে কারফিউ দেবে।

রাতে শুনলাম আব্বা নিচু গলায় আম্মাকে বলছেন, কোনদিন কল্পনা করেছি ইবুর বয়সী ছেলেরা এত সহজে মানুষকে মেরে ফেলার কথা বলবে। যেন ব্যাপারটা এত সহজ! ভেবেছিলে?

আম্মা কোন কথা বললেন না। আব্বা আবার বললেন, কেন এমন হল বল দেখি? কেন?

আম্মা তবু কিছু বললেন না।

খোদা তুমি কি করলে এই দেশটাকে? কি করলে?

আমি শুনলাম আম্মা নিচু গলায় কাঁদছেন। আমি আগে কখনো আম্মাকে কাঁদতে

শুনিনি। দুঃখে আমার বুকটা ভেঙে যেতে লাগল।

৭·

শফিক ভাই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে গেলেন একদিন। কেউ অবিশ্যি সেটা জানল না, জানলে শফিক ভাইয়ের চাচার বড় বিপদ হতে পারে। সবাই জানল যে শফিক ভাইয়ের বাবার শরীর ভাল না, তাই বাড়ি গেছেন। আমি অবিশ্যি জেনে গেলাম। জানলাম অন্য কারণে।

অরু আপাকে অনেকদিন দেখি না। শহরে মিলিটারী আসার পর রাস্তাঘাটে কমবয়েসী মানুষ একেবারে বের হয় না। ছেলেরাও নয়, মেয়েরাও নয়। একদিন আম্মা আমাকে পাঠালেন অরু আপাদের বাসায় 'খাবনামা' নামে একটা বই আনতে। কোন স্বপ্ন দেখার কি অর্থ সেই বইয়ে লেখা আছে। আম্মা কয়েক রাত থেকে কি একটা স্বপ্ন দেখছেন, সেটার কি অর্থ সেটা জানতে চান।

আমাকে দেখে অরু আপা বললেন, কি রে ইবু, তোকে দেখি না আজকাল! রাজাকারে যোগ দিয়েছিস নাকি?

রাজাকার? সেটা মানে কি?

তাও জানিস না? কোন দুনিয়ায় থাকিস? জানিস না মিলিটারী রাজাকার বাহিনী খুলছে? থাকা-খাওয়া-লুটপাট ফ্রী। মাসের শেষে বেতন। নাম লিখিয়ে দে—

যাও ঠাট্টা কর না।

অরু আপা হঠাৎ বললেন, ইবু সত্যি করে বল দেখি আমি কি কলসীর মত মোটা হয়ে গেছি?

আমি অরু আপার দিকে তাকালাম। কোথায় মোটা, মনে হল আরো শুকিয়ে গেছেন।

কি, কথা বলছিস না কেন?

না, অরু আপা, তুমি মোটা হও নাই।

শুধু খিদে পায়। বুঝলি? যেটা দেখি সেটাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। একটা আস্ত কলাগাছ খেয়ে ফেললাম সেদিন।

যাও! কলাগাছ আবার কেমন করে খায়?

খায়। ভিতরের শাঁসটা রান্না করে খায়। আমাকে যদি বিয়ে করিস তোকে রান্না করে খাওয়াব।

যাও!

অরু আপা আজকে আমাকে বেশি জ্বালাতন করলেন না। হঠাৎ গলা নামিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে বললেন, তোর শফিক ভাইকে একটা কথা বলে আসতে পারবি?

কি কথা?

বলবি আজকে সন্ধ্যেবেলা— অরু আপা থেমে গিয়ে বললেন, তার থেকে আমি কাগজে লিখে দেই।

দাও।

অরু আপা একটা কাগজ বের করে লিখতে লাগলেন, আমি বললাম, শফিক ভাইয়ের বাসা এতো কাছে, তুমি নিজেই তো যেতে পার।

মাথা খারাপ হয়েছে তোর? রাস্তাঘাটে মিলিটারী গিজগিজ করছে, তার মাঝে আমি বের হব?

আমার মনে পড়ল রাস্তাঘাটে আজকাল কমবয়সী কোন মানুষ নেই। ছেলেও নেই মেয়েও নেই। শুধু বুড়ো আর বাচ্চারা।

অরু আপার চিঠিটা নিয়ে আমি শফিক ভাইয়ের বাসায় গেলাম। চিঠিতে অরু আপা কি লিখেছেন একটু পড়ার ইচ্ছে করছিল কিন্তু আরেকজনের চিঠি পড়া ঠিক না, তাই আর পড়লাম না। শফিক ভাইকে কখনো বাসায় পাওয়া যায় না, কিন্তু আজকাল শফিক ভাইদের বয়সী মানুষেরা চব্বিশ ঘণ্টা বাসায় বসে থাকে।

শফিক ভাই টেবিলের উপর পা তুলে ছোট একটা লাল রংয়ের নামাজ শিক্ষা মন দিয়ে পড়ছেন। তাঁর মুখে খোচাখোচা দাড়ি, বেশ বড় হয়ে গেছে, মনে হয় অনেকদিন দাড়ি কাটেন নি। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর ইবু?

অরু আপা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

তাই নাকি?

শফিক ভাই বাইরে খুব উৎসাহ দেখালেন না, কিন্তু আমি জানি ভিতরে ভিতরে তাঁর খুব আগ্রহ। আমি চিঠিটা দিলাম, শফিক ভাই চিঠিটা না পড়েই তাঁর পকেটে রেখে দিলেন। আমি চলে গেলে নিশ্চয়ই পড়বেন। শফিক ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানের কয় কলমা?

আমি বললাম, চার।

কি কি?

কলমা তৈয়ব, কলমা শাহাদাৎ— আর আর—

আমি আর মনে করতে পারলাম না। শফিক ভাই হতাশ ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বললেন, এখনও জানো না? তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

কি দুঃখ?

মিলিটারীরা ধরে প্রথমে জিজ্ঞেস করে, বাঙালী আউর বিহারী? যদি বল বাঙালী তাহলে সাধারণত মেরে ফেলে। যদি তোমার কপাল ভাল হয় আর না মারে তাহলে তখন জিজ্ঞেস করে, মুসলমান আউর হিন্দু? যদি মুসলমান বল তখন জিজ্ঞেস করে কয় কলমা হ্যায়? যদি বলতে না পার তাহলে বুকের মাঝে গুলী না হয় পেটের মাঝে বেয়োনেট।

যদি পারি?

তখন ন্যাংটা করে দেখে খৎনা হয়েছে নাকি।

যান! অসভ্য।

আমাকে অসভ্য বল কেন, পাকিস্তানীদের বল। দেখছ না দাড়ি কাটছি না কতদিন থেকে। পকেট থেকে একটা গোল টুপি বের করে মাথায় দিয়ে চশমাটা খুলে পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, আমাকে দেখতে এখন কিসের মত লাগছে?

আমি হি হি করে হেসে বললাম, আমাদের স্কুলের দপ্তরীর মতন।

ধুর বোকা! আমি হচ্ছি তালেবুল এলেম, মাদ্রাসার ছাত্র। মিলিটারীরা নাকি মাঝে মাঝে মাদ্রাসার ছাত্রদের ছেড়ে দেয়।

তুমি কেন এরকম সাজগোজ করছ?

শফিক ভাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে অরু আপার চিঠিটা বের করে চিঠিটার উপর হাত বুলিয়ে আবার পকেটে রেখে বললেন, এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

কোথায় যাবে? মুক্তিবাহিনীতে?

শফিক ভাই ঘুরে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, খবর্দার, কাউকে বলবে না। জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠিক আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

যে রাস্তা দিয়ে যাব সেখানে মিলিটারীদের সাথে দেখা হওয়ার কথা না, তবু যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সেজন্য প্রিপারেশান নিচ্ছি। যেখানে বেঁচে থাকার প্রশ্ন সেখানে কোন ফাঁকিঝুকি নেই।

শফিক ভাই!

কি?

জয় বাংলা কি হবে?

জিজ্ঞেস করছ বাংলাদেশ কি স্বাধীন হবে?

হ্যাঁ।

অফকোর্স হবে। তোমার সন্দেহ আছে?

আপনি যদি বলেন তাহলে নাই।

স্বাধীনতার জন্যে কতজন মানুষ মারা যাবে জানি না, কিন্তু এ দেশ স্বাধীন হবেই। হবেই হবে।

শফিক ভাই কেমন যেন রাগী-রাগী চোখে তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন, দেখে আমার ভয় ভয় করতে থাকে।

কয়দিন পর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি শফিক ভাই নেই। বুঝতে পারলাম মুক্তিবাহিনীতে চলে গেছেন। চিন্তা করেই আমার এক ধরনের উত্তেজনা হতে থাকে।

ইশ ! আমি যদি যেতে পারতাম।

আমি অরু আপার বাসায় গেলাম। অরু আপা হাঁটুতে মাথা রেখে বিছানায় অন্যমনস্কভাবে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ইবু আয়।

অরু আপার মুখটা কেমন জানি দুঃখী-দুঃখী মনে হয়। আমাকে আজকে বিয়ে নিয়ে কোন ঠাট্টাও করলেন না। আস্তে আস্তে বললেন, ইবু, এরকম কেন হল জানিস তুই?

কি রকম?

এই যে একদিন একদিন করে বেঁচে থাকা। একটা দিন পার হলে মনে হয়, যাকে বাবা, আরো একটা দিন বাঁচলাম।

আমার খুব ইচ্ছে অরু আপাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলি। কিন্তু আমি কি বলব? অনেক চিন্তা করে বললাম, অরু আপা!

কি?

সব মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে গেছে। একদিন স্বাধীন বাংলা হবে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হবে মনে হয় তোর?

হ্যাঁ, অরু আপা। ঠিক হবে।

আবার আমরা কলেজে যাব? তোরা ফুটবল খেলবি? গোল খেয়ে মুখ কাল করে ফিরে আসবি? আমরা মোড়ের দোকান থেকে লজেন্স কিনে আনব?

হ্যাঁ, অরু আপা।

অরু আপা আমাকে কাছে টেনে নিলেন, আমি দেখলাম তাঁর চোখে পানি টলটল করছে।

রাশেদ বিকাল বেলা আমাদের সাথে দেখা করতে এল। আমরা দুইজন দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম। একটু পরে ফজলুও এসে যোগ দিল আমাদের সাথে। আমরা চুপচাপ বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আবার মানুষজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আসছে। রিকশা, সাইকেল যাচ্ছে কিন্তু তবু যেন আগের মত নয়। আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, দেশের খবর জানিস কিছু?

হুঁ।

কি?

জোরেসোরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একটা দল যাচ্ছে, তিন সপ্তাহের ট্রেনিং দিয়ে স্টেনগান আর গ্রেনেড হাতে দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে।

স্টেনগান?

হ্যাঁ।

সেটা কি রকম?

ছোট। ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখা যায়। অটোমেটিক। ট্রিগার টেনে রাখলেই গুলী বের হতে থাকে ট্যাট ট্যাট ট্যাট . . .। সাথে কার্তুজের ক্লীপ থাকে। একটা শেষ হলে আরেকটা লাগিয়ে নেয়।

আর গ্রেনেড?

গ্রেনেড হচ্ছে বোমা। দাঁত দিয়ে পিন খুলে ছুঁড়ে মারতে হয়। তিন সেকেন্ড পরে ফাটে। বুম। মিলিটারী শালাদের আর রক্ষা নাই।

রাশেদ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বলল, এই দ্যাখ।

কি?

লিস্ট করছি।

কিসের লিস্ট?

দালালদের লিস্ট। কারা কারা জয় বাংলার বিপক্ষে।

আমরা লিস্টটা দেখলাম। প্রথমে খান সাহেবের নাম। তারপর আজরফ আলী। তারপর আরো কয়েকজনের নাম, আমি চিনি না। কারো নামের পাশে লেখা মুসলীম লীগ, কারো নামের পাশে লেখা জামাতে ইসলামী, কারো নামের পাশে লেখা ইসলামী ছাত্র সংঘ, কারো নামের পাশে লেখা নির্দলীয় সুবিধাবাদী। কে কোথায় থাকে তার ঠিকানা।

রাশেদ বুঝিয়ে দিল, খান সাহেবের নামের পাশে এই কাটা চিহ্ন মানে বুঝেছিস?

মানে মরে গেছে এর মাঝে?

হ্যাঁ। মিলিটারীই মেরেছে!

এই লিস্ট দিয়ে কি করবি?

যখন মুক্তিবাহিনী আসবে তাদের দিব। স্বাধীনতার প্রথম কাজই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের খতম করা। যদি তাদের খতম না করিস তাহলে—

তাহলে কি?

তাহলে দশ বিশ বছর পরে তারা আবার পাকিস্তানীদের ডেকে আনবে।

ধুর! সেটা আবার কেমন করে হবে?

হয়। আমি পড়েছি বইয়ে।

আমার চুপ করে গেলাম। সত্যি সত্যি যদি সে বইয়ে পড়ে থাকে তাহলে তো আর এটা নিয়ে তর্ক করা যায় না। আর এটা তো সবাই জানে রাশেদ হচ্ছে রাজনীতির মানুষ, সে যদি "প্রেতপুরীর অট্টহাস্য" না পড়ে রাজনীতির বই পড়ে তাহলে অবাক হবার কি আছে?

রাশেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখন আমাদের এই লিস্টটা শেষ করতে হবে। তারপরে ম্যাপ তৈরি করতে হবে।

ম্যাপ? কিসের ম্যাপ?

আমাদের স্কুলের। মিলিটারীরা ক্যাম্প করেছে তো, মুক্তিবাহিনী যখন আক্রমণ

করবে—

আমরা তো ম্যাপ তৈরি করেছিলাম, মনে আছে? ফজলু চোখ বড় করে তাকাল, মনে আছে?

আমার মনে পড়ল। গত বছর আমরা দিনরাত গুপ্তধন গুপ্তধন খেলতাম। একদল গুপ্তধন লুকিয়ে রাখত অন্যদল সেটা খুঁজে বের করত। গুপ্তধন কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেটা ম্যাপে দেখানো থাকত। আমরা অনেক যত্ন করে সেইজন্যে স্কুলের ম্যাপ তৈরি করেছিলাম। সব শুনে রাশেদের চোখ চকচক করতে থাকে। বলে, কোথায় আছে সেই ম্যাপ?

আমি আর ফজলু মাথা চুলকালাম, কারণ আমাদের জিনিসপত্র কখনোই ঠিক জায়গায় থাকে না। ফজলু বলল, আশরাফের কাছে নিশ্চয়ই আছে।

হ্যাঁ, আমি মাথা নাড়লাম, আশরাফই আসলে বেশি কাজ করেছে। মনে আছে, গ্রাফ পেপারে মেপে মেপে সব কিছু এঁকেছে?

হ্যাঁ, কোথায় পুকুর, কোথায় লাইব্রেরি, জামরুল গাছ। তখন, মনে আছে আমরা কত বিরক্ত হয়েছিলাম আশরাফের উপর? সব সময় যে বাড়াবাড়ি করত!

রাশেদ হাতে থাবা দিয়ে বলল, এই ম্যাপ যদি থাকে তাহলে তো আর কোন চিন্তাই নাই। এখন কোনখানে বাংকার, কোনখানে ট্রেঞ্চ, কোনখানে গোলাগুলী সেগুলি বসিয়ে দিলেই হবে। তারপর যখন মুক্তিবাহিনী আসবে—

তখন কি হবে?

এই ম্যাপ দেখে ফাইট হবে!

সত্যি?

হ্যাঁ। রাশেদ আমাদের দিকে তাকাল। চকচকে চোখে বলল, তোরা আমাকে সাহায্য করবি?

করব।

টপ সিক্রেট কিন্তু। একবারে টপ সিক্রেট।

ঠিক আছে।

উত্তেজনায় হঠাৎ আমাদেরও বুক কেমন করতে থাকে। আমরা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেই, হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

রাস্তায় লোকজন হঠাৎ দ্রুত এদিকে সেদিকে সরে যেতে থাকে। রাশেদ ফিসফিস করে বলল, মিলিটারী আসছে। মিলিটারী।

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি। প্রথমে শুকনো কয়েকজন মানুষ, রাইফেল হাতে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় বাঙালী। রাশেদ ফিসফিস করে বলল, রাজাকার বাহিনী।

রাজাকার বাহিনীর পিছু পিছু একদল মিলিটারী। চকচকে কাপড় পরা। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। কোমরে গুলীর বেল্ট।

রাশেদ ফিসফিস করে বলল, চাইনিজ মেশিনগান।

মিলিটারীগুলি এক লাইনে হেঁটে যাচ্ছে। বুটের শব্দ হচ্ছে পাকা রাস্তায়। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

রাশেদ দেওয়াল থেকে নেমে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছিস?

দেখি মিলিটারীরা কি করে।

রাশেদ মিলিটারীদের পিছু পিছু হেঁটে যেতে থাকে। আমারও কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু আব্বার কড়া নিষেধ কোথাও যাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যেবেলা পূর্বদিকে লাল হয়ে রইল। মনে হল আগুন লেগেছে। মিলিটারীরা ওদিকেই যাচ্ছিল।

৮.

অনেকদিন থেকেই আমাদের স্কুলে যেতে হয় না। আমার ধারণা ছিল স্কুলে না যাওয়ার থেকে আনন্দের বুঝি আর কিছু নেই। কিন্তু কয়দিন থেকে দেখা যাচ্ছে ব্যাপরটা সেরকম না।

স্কুলে যে জন্যে যেতে হচ্ছে না সে জন্যে অন্য কিছুই করা যাচ্ছে না। আমাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ। খেলাধুলা বন্ধ। মাঝখানে স্কুলের ম্যাপটা নিয়ে কাজ করেছিলাম, সেটাও শেষ হয়েছে। রাশেদ এখন তার মাঝে অন্যান্য জিনিসগুলি লিখছে। দিলীপের সাথে আমি অনেক খেলতাম, সে এখন কোথায় আছে জানি না। আশরাফ আর ফজলুর সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয় কিন্তু দুজনেই বেশ মনমরা। রাশেদ শুধু মাত্র মুখ শক্ত করে ঘুরে বেড়ায়। তার ধারণা, মুক্তিবাহিনী এল বলে, তারপর মিলিটারী, রাজাকার আর দালালদের অবস্থা একেবারে কেরোসিন হয়ে যাবে।

আমার বাসার বাইরে বেশিদূর যাওয়া নিষেধ। তবু আমি মাঝে মাঝে একটু ঘুরে আসি। আমার বয়সী বাচ্চাদের বেশি ভয় নেই। রাস্তাঘাটে বেশ কয়েকবার মিলিটারীদের সাথে সামনাসামনি দেখা হয়েছে। আমার বুক ধুকধুক করছিল কিন্তু তারা কিছু করেনি। আস্তে আস্তে আমারও সাহস বেড়েছে, মিলিটারী দেখলে মাঝে মাঝে তাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াই। সব সময় তারা এক সাথে গুলি অনেক থাকে। দোকানপাটে ঢুকে জিনিসপত্র নিয়ে দাম না দিয়ে বের হয়ে আসে। একদিন একজন দাম চাইতেই রাইফেলের বাট দিয়ে পেটে গদাম করে মেরে বসল। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে এল লোকটার।

বাসায় এসে অবিশ্যি আমি সেগুলি বলি না। বললে আর বাসা থেকে বের হতে দেবে না। আব্বার মুখে শুধু একটাই কথা, ঘরে বসে ইংরেজি ট্রানস্লেশান করতে পারিস না?

একদিন সকালে রাশেদ এসে বলল, তোর কাছে দশ পয়সা হবে?

কেন?

সে গলা নামিয়ে বলল, একটা খাম কিনতে হবে। দশ পয়সা কম পড়েছে।

কাকে চিঠি লিখবি?

রাশেদ আরো গলা নামিয়ে বলল, আজরফ আলীকে।

কি লিখবি?

লিখে ফেলেছি। এই দ্যাখ। সে সাবধানে পকেট থেকে রুলটানা একটা কাগজ বের করল। উপরে এক পাশে লেখা 'জয় বাংলা', অন্যপাশে লেখা 'জয় বঙ্গবন্ধু', তার নিচে একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা ঃ

শালা আজরফ আলী,

তুই পাকিস্তানের দালাল মীরজাফর। বিশ্বাসঘাতক।

তুই শুধু যে বিশ্বাসঘাতক তাই না, তুই মুখে ইসলামের কথা বলিস কিন্তু তুই ইসলামের কোন কাজ করিস না। আল্লাহ্ তোকে সেইজন্যে হাশরের ময়দানে কখনো ক্ষমা করবে না। এই পৃথিবীতে আমরাও তোকে ক্ষমা করব না। তোর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তুই ভাল-মন্দ খেতে চাস তো তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, কারণ আর কয়েকদিনের মাঝেই তোর জায়গা হবে জাহান্নামে। সেখানে তুই খাবি দোজখের আগুন।

হা হা হা হা হা।

ইতি — **আজরাইল**

আমি অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকালাম। রাশেদ মুচকি হেসে বলল, শালার ব্যাটাকে একটু ভয় দেখিয়ে দেই।

কিন্তু দেখে তো বোঝা যাচ্ছে এটা তোর হাতের লেখা— একটা ছোট ছেলের হাতের লেখা।

রাশেদ মাথা চুলকে নিচে আরো একটা লাইন লিখে দিল, হাতের লেখা দেখে যেন চিনতে না পারিস সে জন্যে বাম হাতে লিখলাম।

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ, এবারে ঠিক হয়েছে, মনে করবে বাম হাতে লিখেছে বলে হাতের লেখা এরকম কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং।

রাশেদ মেঘস্বরে বলল, আমার হাতের লেখা কখনোই কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং না। বেশি কথা না বলে দশ পয়সা থাকলে দে।

আমি আর তর্ক করলাম না, দশ পয়সা বের করে দিলাম। তারপর দুজনে মিলে পোস্ট অফিসে হেঁটে গিয়ে একটা খাম কিনে উপরে আজরফ আলীর ঠিকানা লিখে, ভিতরে চিঠিটা দিয়ে একটা চিঠির বাক্সে ফেলে দিলাম।

দুদিন পরে রাশেদ এসে বলল, চিঠিতে কাজ হয়েছে মনে হয়।

কেন?

আজরফ আলীর অবস্থা কেরোসিন! আর ঘর থেকে বের হয় না। রাশেদ খুব খুশি হয়ে খিকখিক করে হাসতে থাকে।

আমি আর রাশেদ মিলে আজরফ আলীর বাসার কাছে দিয়ে হেঁটে এলাম। দেখলাম, দুইজন রাজমিস্ত্রী বাসার সামনের দেওয়ালের উপর ইট গেঁথে সেটাকে আরো উঁচু করছে। সামনে একজন রাজাকার রাইফেল হাতে পাহারা।

এর দুইদিন পর রাশেদ এমন একটা কাজ করল যে বলার নয়। আমি সেদিন রাশেদের সাথে বাজারের কাছ দিয়ে আসছি, শান্তি কমিটির অফিসের সামনে একটু দাঁড়ালাম। আওয়ামী লীগের অফিসটা পুড়িয়ে দিয়েছে। ন্যাপের অফিসটা পোড়ায়নি, শুধু ভাঙচুর করেছে, সেটাই এখন ঠিকঠাক করে শান্তি কমিটির অফিস। শান্তি কমিটির কাজকর্ম খুবই সহজ, রাজাকার বাহিনী নিয়ে মানুষজনের ঘরবাড়ি লুটপাট করে আনা। যাদের সাথে শত্রুতা আছে মিলিটারী নিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনকে গুলী করে মারা। কেউ মুক্তিবাহিনীতে গেছে খবর পেলে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে মিলিটারীরা যখন কাউকে ধরে আনে তখন তাদের আত্মীয়স্বজনরা এসে শান্তি কমিটির লোকজনের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করে। কেউ তখন খালি হাতে আসে না, টাকাপয়সা নিয়ে আসতে হয়।

আমরা উঁকি মেরে দেখলাম, অফিসের ভিতর আজরফ আলী একটা চেয়ারে খুব রাগ-রাগ চেহারা করে বসে আছে। তার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে একজন বুড়ো মানুষ হাউমাউ করে কাঁদছে। আহা বেচারা! নিশ্চয়ই তার ছেলেপিলে কাউকে মিলিটারী ধরে নিয়ে এসেছে।

খানিকক্ষণ সেটা দেখে আমরা রাজাকার বাহিনীর অফিসে গেলাম। আগে সেটা নগেন ডাক্তারের চেম্বার ছিল। নগের ডাক্তার পুরানো আমলের এল. এম. এফ. ডাক্তার, খুব ভাল ডাক্তার। দুই-তিনটা এম. বি. বি. এস. ডাক্তার নাকি পকেটে রেখে দিতে পারেন। নাড়ি ধরে নাকি বলে দিতে পারতেন রোগী দুদিন আগে কি খেয়েছে। নগেন ডাক্তারকে সবাই ইণ্ডিয়া চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হননি। সারা জীবন এখানে কাটিয়েছেন, এটা তার মাটি, এই মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। মিলিটারী আসার এক সপ্তাহ পরে রাজাকার বাহিনী তৈরি হল, তারা এসে নগেন ডাক্তারকে গুলী করে মেরে তার চেম্বরটা দখল করে নিয়ে রাজাকার বাহিনীর অফিস তৈরি করেছে। আমরা সময় পেলে রাজাকার বাহিনীর অফিসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করি। কি করে না করে সেটা দেখি। আজকেও দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন দেখি চুন্নু মিয়া দুইজন রাজাকার নিয়ে বের হল। চুন্নু মিয়ার হাতে কিছু নেই কিন্তু অন্য

দুইজন রাজাকারের হাতে একটা করে রাইফেল। চুন্নু মিয়া আগে ঠ্যালাগাড়ি ঠেলত, মিলিটারী আসার পর এক লাফে রাজাকার কমান্ডার হয়ে গেছে।

রাজাকার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল দেখায় না, আমরা তাই হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছিলাম তখন শুনলাম চুন্নু মিয়া বলল, আজরফ আলী চেয়ারম্যানকে চিনিস তো?

জে।

এক্ষুনি গিয়ে খবরটা দিবি। দেরি যেন না হয় শুওরের বাচ্চারা।

জে, দেরি হবে না।

যা হারামজাদারা, যা।

আমরা তাড়াতাড়ি হেঁটে রওনা দিলাম, চুন্নু মিয়ার এবং রাজাকার বাহিনীর লোকজনের কথাবার্তা খুব খারাপ, গালাগালি না দিয়ে কথা বলতে পারে না। আমরা হেঁটে যেতে যেতে দেখি, রাজাকার দুইজন পিছনে পিছনে আসছে। তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে কিন্তু দুইজনের কোন তাড়া নেই, একটা পান দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে দুইজন।

শান্তি কমিটির অফিসের কাছাকাছি আসতেই দেখি আজরফ আলী আসছে। সাথে কেউ নেই, একা। রাশেদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বলল, তুই চলে যা, আমি একটা মজা করি।

কি মজা?

দেখবি এক্ষুনি, তুই চলে যা। তোকে যেন না দেখে।

আমি তাড়াতাড়ি একটা গলিতে ঢুকে গেলাম।

রাশেদ শার্টের একটা বোতাম খুলে মাথার উপরে তুলে মুখটা ঢেকে ফেলল যেন তার চেহারা চেনা না যায়। তারপর আজরফ আলীর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, পাকিস্তানী দালাল দুইজন মুক্তিযোদ্ধা পাঁচ মিনিটের মাঝে তোকে গুলী করে মারবে।

কি বললি? কি বললি? কি? কি?

রাশেদ ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছে। আজরফ আলীকে কেমন জানি একটু ভীত দেখাল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রাশেদ যেদিক দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে আবার হেঁটে যেতে থাকে। মনে হয় পুরো ব্যাপারটা সে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়, রাস্তার অন্য পাশে রাইফেল হাতে দুজন রাজাকারকে দেখতে পেয়েছে। তারাও আজরফ আলীকে দেখে ছুটে আসছে আজরফ আলীর দিকে।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম রাশেদ কি করেছে। রাজাকার দুজনকে দেখে আজরফ আলী মনে করেছে তারা মুক্তিবাহিনী, তাকে মারতে আসছে। ভয়ে, আতংকে তার চোয়াল ঝুলে পড়ল। চিৎকার করে ঘুরে গেল, তারপর প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। আমার সামনে দিয়ে প্রথমে ছুটে গেল আজরফ আলী, তার পিছনে পিছনে

দুজন রাজাকার। আমি গলি থেকে বের হয়ে দাঁড়ালাম, দেখলাম, বিশাল থলথলে দেহ নিয়ে ছুটে যাচ্ছে আজরফ আলী। হোঁচট খেয়ে পড়ল একবার, কোনমতে উঠে দাঁড়াল, তারপর আবার চিৎকার করে ছুটতে থাকে। আবার আছাড় খেয়ে পড়ল, কোন মতে উঠে দাঁড়াল, তারপর সাথে সাথেই পা বেধে আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল। এবারে আর উঠতে পারল না. কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করল, উঠতে না পেরে হামাগুড়ি দিয়েই যেতে থাকে আর প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে। মোটা, বয়স্ক মানুষ, দৌড়ে অভ্যাস নেই, বেকায়দা পড়ে হাত–পা কিছু ভেঙে গেছে কি না কে জানে।

রাজাকার দুজন এতক্ষণে দৌড়ে তার কাছে এসে গেছে। আজরফ আলী হঠাৎ দুই হাত জোড় করে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি এর আগে কোন মানুষকে এত ভয় পেতে দেখি নাই, এবারে দেখলাম। এটাকে নিশ্চয়ই মৃত্যুভয় বলে। কি ভয়ংকর আতংক তার চোখে–মুখে, মরার আগে মানুষ মনে হয় এভাবে তাকায়।

হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আজরফ আলী দুই হাত জোড় করে রাজাকার দুইজনের সামনে মাথা নিচু করে বলতে থাকে, বাবারা, আমাকে মাফ করে দাও। মাফ করে দাও। আল্লাহর কসম লাগে বাবারা। আমি ইচ্ছা করে করি নাই, জান বাঁচানোর জন্যে করেছি। আমি জয় বাংলার পক্ষে, আমি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। আমি মাপ চাই, মাপ চাই —

দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায় তাকে ঘিরে। রাজাকার দুইজন হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু এগিয়ে আসতেই আজরফ আলী একেবারে তাদের পা জড়িয়ে ধরে। একজনের পায়ে মুখ ঘষতে থাকে, তার দাড়িতে জুতার ময়লা লেগে নোংরা হয়ে যায়। তার টুপি খুলে পড়ে টাকমাথা বেরিয়ে যায়। চোখের পানিতে নাকের পানিতে কুৎসিত দেখাতে থাকে তাকে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি এই মানুষটার দিকে। আবার কেমন জানি গা শির শির করতে থাকে, ঠিক বুঝতে পারি না কেন— কিন্তু আমার কেমন জানি এক ধরণের লজ্জা করতে থাকে। মানুষকে এত ছোট হতে দেখলে নিশ্চয়ই লজ্জা লাগে সবার। কিন্তু আমি চলেও যেতে পারছিলাম না। নিষিদ্ধ জিনিস দেখার একরকম আকর্ষণ থাকে, আমি সেই আকর্ষণের মাঝে আটকা পড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রাজাকার দুজনের একজন তখন আজরফ আলীকে টেনে তুলে বলল, হুজুর, আমরা মুক্তিবাহিনী না, আমরা রাজাকার বাহিনী।

হঠাৎ করে আজরফ আলী মনে হল নিজের ভুল বুঝতে পারল। বোকার মত রাজাকার দুইজনের দিকে তাকাল, তারপর ঘুরে অন্য সব মানুষজনের দিকে তাকাল। আমি দেখতে পেলাম প্রচণ্ড রাগে তার মুখ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠেছে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। তাকে ঘিরে অনেক বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, সে তাদের মাঝে রাশেদকে খুঁজছে। হঠাৎ আমি আতংকে একেবারে সিটিয়ে গেলাম— একেবারে আজরফ আলীর নাকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদ ! যদি চিনে ফেলে? কিন্তু চিনতে

পারল না, বৃথাই রাশেদকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে করতে হিংস্র স্বরে বলল, কোথায় সেই শুওরের বাচ্চা? কোথায়?

একজন জিজ্ঞেস করল, কে?

শুওরের বাচ্চা বদমাইশ ছোড়া —

কে? কি করেছে?

আমি যদি তার চৌদ্দ গুষ্ঠিকে শিক্ষা না দেই! বাপ চাচা সবাইকে যদি এক কবরে মাটি না দেই! ভিটা মাটিতে যদি শকুন না চড়াই তাহলে আমার নাম আজরফ আলী না।

একজন রাজাকার জিজ্ঞেস করে, কার কথা বলছেন হুজুর? কার কথা?

এইটুকু ছেলে, আমাকে এসে বলে —

কি বলে?

বলে, বলে— আজরফ আলী কথা বন্ধ করে হিংস্র চোখে এদিকে সেদিকে তাকাতে থাকে।

আমি রাশেদের সাহস দেখে বোকা বনে যাই। একেবারে আজরফ আলীর নাকের সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, তার আশে পাশে আরো নানা বয়সী ছেলে। এত জনের মাঝে আজরফ আলী কেমন করে রাশেদকে খুঁজে বের করবে? তা ছাড়া শার্ট দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিল, চেহারাও তো দেখেনি আজরফ আলী।

একজন রাজাকার এবারে হুংকার দিয়ে বলল, সবাই দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন নাকি? যান যান, সরেন।

লোকজন সরে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখালো না। মজার গন্ধ পেয়ে বরং আরো বেশি লোক জমে যেতে শুরু করল। আজরফ আলী বেকায়দায় পড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই খুব ব্যথা পেয়েছে, দরদর করে ঘামছে। দৌড়াদৌড়ি করে অভ্যাস নেই, এখনো মাছের মত খাবি খাচ্ছে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, আবার ধপ করে বসে পড়ে কোঁকাতে লাগল।

রাজাকার দুইজন আবার লোকজনকে সরানোর চেষ্টা করল কিন্তু কোন লাভ হল না। ভিড় বরং আরো বেড়ে যেতে থাকে। শেষে কোন উপায় না দেখে একটা রিকশা থামিয়ে সেখানে আজরফ আলীকে তুলে সরিয়ে নেয়। সে তখনো যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করে দরদর করে ঘামছে।

লোকজন সরে গেলে আমি রাশেদকে ফিসফিস করে বললাম, তুই তো সাংঘাতিক মানুষ! ডেঞ্জারাস!

রাশেদ দাঁত বের করে হেসে বলল, এইটা তো খালি মজা করলাম। যখন সত্যিকার টাইট হবে সেদিন বুঝবে মজা।

রাত্রে শুনলাম আব্বা আম্মাকে বলছেন, শুনেছ আজরফ আলীর কি হয়েছে

আজ?

আজরফ আলী কে?

শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান।

কি হয়েছে তার?

একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে ধরেছিল রাস্তায়। বলেছে তোমার দিন শেষ। কলমা পড়—

তাই বলেছে? মুক্তিযোদ্ধা?

হ্যাঁ। মুক্তিযোদ্ধার কাছে স্টেনগান ছিল, স্টেনগানটা যেই বের করবে তখন দুইজন রাজাকার এসে হাজির।

সর্বনাশ! তারপর?

কেউ কেউ বলছে তখন একটা যুদ্ধ হয়েছে, কেউ কেউ বলছে যুদ্ধ হয়নি, মুক্তিযোদ্ধাটি বাতাসের মত উবে গিয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, আব্বা হাসতে হাসতে বললেন, আর আজরফ আলী মনে করেছে রাজাকার দুজন মুক্তিযোদ্ধা। তখন নাকি তাদের পা ধরে ভেউভেউ করে কান্না!

সত্যি? মুক্তিবাহিনী তাহলে শহরে নামতে শুরু করেছে?

তাই তো মনে হয়।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলাম। সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না।

পরদিন আমি আর রাশেদ মিলে আজরফ আলীর কাছে দুই নম্বর চিঠিটা পাঠালাম। সেটা শুরু হল এইভাবে:

> এই বার তুই রাজাকারের পায়ে মুখ ঘষেছিস,
> মাপ চেয়েছিস— তারা তোকে মাপ করে দিয়েছে।
> আর কয়েকদিনের মাঝে আমি যখন তোর
> সামনে দাঁড়াব আমার পায়ে মুখ ঘষে তোর কোন
> লাভ হবে না! আমি তোকে মাপ করব না। . . .

৯.

সপ্তাহখানেক পরে একদিন খুব সকালে রাশেদ এসে হাজির। স্কুল নাই কিছু নাই সকালে উঠার তাড়া নাই, ঘুম থেকে উঠতে উঠতে কোনদিন বেলা দশটা বেজে যায়। রাশেদ এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। আমি চোখ কচলে ঘুম থেকে উঠে বললাম, তুই? এত সকালে?

মোটেও সকাল না। দশটা বাজে।

দশটা বেজে গেছে?

হ্যাঁ। রাশেদ চিন্তিত মুখে বলল, খালাম্মা মনে হয় তোর উপর একটু রেগে আছেন।

কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইবু কি বাসায় আছে? খালাম্মা বললেন, লাট সাহেব এখনো ঘুমাচ্ছে, দেখ তুলতে পার কিনা। বিছানা থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে বললেন তোকে।

আমি চোখ থেকে ঘুম সরানোর চেষ্টা করতে করতে বললাম, আম্মা এভাবেই কথা বলে! তুই এত সকালে এসেছিস কেন?

খবর আছে।

আমার ঘুম চটে গেল, কি খবর?

এখানে বলা যাবে না। বাইরে যেতে হবে।

এখনো মুখ ধুই নি, নাস্তা করি নি।

তাহলে মুখ ধুয়ে নাস্তা কর। বিছানায় লাট সাহেবের মত শুয়ে আছিস কেন?

আমি উঠে মুখ ধুয়ে এলাম। আম্মা রাশেদকে বললেন, আস তুমি ইবুর সাথে নাস্তা কর।

না খালাম্মা আমি নাস্তা করে এসেছি।

আরেকটু খাও।

না খালাম্মা। যদি বলেন এক কাপ চা খেতে পারি।

চা?

জ্বী। কড়া লিকার রং চা। ফ্রেস পাত্তি।

আম্মা একটু অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার বুঝতে একটু সময় লাগল "কড়া লিকার রং চা ফ্রেস পাত্তি" মানে কি। রাশেদ যখন আজীজ মিয়ার রেস্টুরেন্টে চা খেতে যায় চা অর্ডার দেবার সময় সব সময় এইটা বলে। বাসায় আমাকে চা খেতে দেয়া হয় না, কিন্তু আম্মা রাশেদকে নতুন চায়ের পাতা দিয়ে কড়া লিকারের দুধ ছাড়া চা তৈরি করে দিলেন। আমি যখন নাস্তা করছিলাম রাশেদ তখন খুব সখ করে তার চা চুমুক দিয়ে দিয়ে খেল।

নাস্তা করে আমি রাশেদকে নিয়ে বের হলাম। বাসার সামনে দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে রাশেদ গলা নামিয়ে বলল, মুক্তিবাহিনী এসে গেছে।

এসে গেছে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

নদীর ওপারে।

সত্যি?

হ্যাঁ। ছোট একটা দল এসেছে স্পেশাল মিশনে।

কি মিশন?

স্পেশাল মিশন।

সেটা আবার কি?

রাশেদ মাথা নাড়ল, আমি জানি না। আমাদের সাথে দেখা করতে চায়।

আমি চমকে উঠলাম, কার সাথে?

আমাদের সাথে।

কেন?

মনে আছে আমার স্কুলের ম্যাপ তৈরি করেছিলাম? মিলিটারী ক্যাম্পের সবকিছু দিয়ে? মনে আছে?

হ্যাঁ।

সেইটা মুক্তিবাহিনীর খুব পছন্দ হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কেমন করে পেল তারা?

আমি দিয়েছি।

তুই কেমন করে দিলি?

রাশেদ রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে, মাথা নেড়ে বলে আমার সব জায়গায় কানেকশান আছে।

তারা এখন আমাদের সাথে দেখা করতে চায়?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা— আমরা এত ছোট?

ছোট আর বড় আবার কি, দায়িত্ব নিয়ে কথা। ছোট বলে আমরা বড় দায়িত্ব নিতে পরি না?

আমি মাথা নাড়লাম, তা ঠিক।

উত্তেজনায় আমার বড় বড় নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন করে দেখা করব? কবে দেখা করব?

আজ রাতে।

আজ রাতে? আকাশ থেকে পড়লাম, আজ রাতে কেমন কের দেখা করব।

রাশেদ মাথা নাড়ল, তাই বলেছে, সময় নাই হাতে। আমি যাব দেখা করতে। তুই যেতে চাস?

আমি? আজ রাতে?

হ্যাঁ।

কেমন করে যাব? বাসায় কি বলব?

সেটা জানি না। কোন একটা মিছে কথা বলে —

কি মিছে কথা বলব? আমি খানিকক্ষণ বসে চিন্তা করি, সত্যিকার একটা মুক্তিবাহিনীর দলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার এমন একটা সুযোগ কেমন করে ছেড়ে দিই?

রাশেদ বলল, তোর আম্মাকে বল আজ রাতে আমাদের বাসায় থাকবি। তুই যদি চাস আমি গিয়ে বলতে পারি।

আমি মাথা নাড়লাম, উঁহু তুই বললে কোন লাভ হবে না। তোর আব্বা না হয় আম্মা বললে একটা কথা ছিল। তা ছাড়া এখন এই মিলিটারী চারিদিকে, প্রতি রাতে দশটার পর কারফিউ, আম্মা রাতে কোথাও যেতে দেবে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার অরু আপার কথা মনে পড়ল। আমি রাশেদের দিকে তাকালাম, তবে—

তবে কি?

অরু আপাকে দিয়ে হতে পারে।

অরু আপা?

হ্যাঁ— আমি ভুরু কুচকে চিন্তা করতে থাকি। একটা ফন্দী করা যায়, ধরা পড়লে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে, আব্বা মনে হয় একেবারে জানে মেরে ফেলবেন। কিন্তু দেশের জন্যে এইটুকু যদি না করি তাহলে কেমন করে হয়? রাশেদকে বললাম, তুই বিকালে এসে একবার খোঁজ নিবি? আমি দেখি একটা কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না।

রাশেদ চলে গেল। আমি আমার ফন্দীটা কাজে লাগানোর জন্যে গেলাম অরু আপার বাসায়। অরু আপা কানে রেডিও লাগিয়ে খবর শুনছিলেন। আমাকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন, শুনেছিস?

কি?

মুক্তিবাহিনী সত্যি সত্যি যুদ্ধ শুরু করেছে। একেবারে যাকে বলে ফাটাফাটি! যেরকম সেরকম যুদ্ধ না, একেবারে প্ল্যান প্রোগ্রাম করে যুদ্ধ! বুঝলি, মনে হয় চুল টুল কেটে ছেলে সেজে বের হয়ে যাই মুক্তিযুদ্ধে!

আমি অরু আপার দিকে তাকিয়ে বললাম, তাহলে তুমি কোন কথা বলতে পারবে না। কথা বললেই সবাই বুঝে যাবে তুমি মেয়ে!

অরু আপা গলার স্বর মোটা করে বললেন, আমি এই রকম করে কথা বলব, তাহলে হবে না?

আমি অরু অপার ভাবভঙ্গি দেখে খুকখুক করে হেসে ফেললাম। অরু আপা রেডিওটা বন্ধ করে বললেন, তুই দেখি আজকাল আর আসিস না?

এই তো এসেছি।

নিশ্চয়ই কোন দরকারে এসেছিস। কি দরকার?

তুমি কাউকে বলবে না তো?

আমাকে বিয়ে না করে আর কাউকে বিয়ে করে ফেলেছিস?

যাও! খালি ঠাট্টা তোমার।

ঠিক আছে বলব না। কি দরকার?

আমি খুব সরল মুখ করে একটা বড় মিথ্যা কথা বললাম, আব্বা আমাকে ছয় পৃষ্ঠা ট্রানশ্লেশান করতে দিয়েছে।

ছয় পৃষ্ঠা? অরু আপা ভয় পাওয়ার ভান করে বললেন, এত বড় অত্যাচার? তোর আব্বা কি পাকিস্তানী মিলিটারীদের সাথে যোগ দিয়েছে?

ভেবেছিলাম শেষ করে ফেলব কিন্তু —

শেষ হয় নাই?

না।

আমি এখন তোর ট্রানশ্লেশানগুলি করে দেব?

আমি মাথা নাড়লাম।

কভি নেহী। অরু আপা তার হাতের তালুতে একটি কিল দিলেন।

অরু আপা আর তোমাকে বলব না, এই শেষ বার। তোমাকে তো করে দিতে হবে না, আমি নিজেই করব। শুধু যেখানে আটকে যাব সেখানে বলে দেবে। দেবে? প্লীজ!

ঠিক আছে যা। শুধু একটা শর্ত।

কি শর্ত?

বিয়ের পর আমাকে এক ভরি সোনা দিয়ে একটা নাকফুল—

যাও! খালি তোমার ঠাট্টা। একটা দরকারী জিনিস নিয়ে কথা বলছি—

আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বল।

এই যে ট্রানশ্লেশান— ছয় পৃষ্ঠা ট্রানশ্লেশান তুমি আমাকে দেখিয়ে দেবে সেটা আমার আম্মাকে না হয় আব্বাকে বলবে না।

ঠিক আছে বলব না।

সেটা করার জন্যে আমি আজকে রাতে তোমার কাছে চলে আসব।

সে কি? অরু আপা অবাক হবার ভঙ্গি করে বললেন, বিয়ের আগেই শ্বশুর বাড়ি চলে আসবি মানে?

যাও—

অরু আপা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে চলে আসিস।

বেশি যদি রাত হয় তাহলে থেকে যাব এখানে। তুমি তাহলে প্রিন্স এন্ড পপার বইটা পড়ে শোনাতে পারবে। মনে আছে একটু বাকি আছে?

অরু আপা বললেন, ঠিক আছে।

আমি অরু আপাকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, কোন কিছু সন্দেহ করলেন না। আমি নিঃশ্বাস আটকে রেখে বললাম, তুমি আম্মাকে এখানে থাকার কথাটা বলে দেবে

তাহলে? ট্রানশ্লেশানের কথা বল না।

ঠিক আছে বলে দেব।

আমি খুব সাবধানে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিলাম। আমার ফন্দীটার কঠিন অংশটা করা হয়ে গেছে। রাত্রি বেলা বের হবার সময় আম্মাকে বলব অরু আপার বাসায় যাচ্ছি, বাসায় কেউ সন্দেহ করবে না। তারপর অরু আপার বাসায় এসে বলব অরু আপা আজ রাতে আসতে পারব না, আরেকদিন। অরু আপা কিছু সন্দেহ করবে না, আবার আব্বা আম্মা কিছু জানতে পারবে না।

নিখুঁত পরিকল্পনা তবু আমার বুকটা ধ্বকধ্বক করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ চেষ্টা করে নিজেকে একটু শান্ত করলাম। অরু আপার সাথে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলার জন্যে খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু দুষ্টুমী করে তো বলছি না। দেশের একটা কাজের জন্যে বলছি, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বলছি।

অরু আপা আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, বললেন, কি রে? হঠাৎ করে বুড়ো মানুষের মত এত গম্ভীর হয়ে গেলি?

আমি জোর করে একটু হেসে বললাম, কে বলেছে গম্ভীর হয়েছি।

হ্যাঁ, তোরা ছোট মানুষ হাসি খুশি থাকবি। ছোট মানুষকে গম্ভীর দেখালে খুব খারাপ লাগে।

আচ্ছা অরু আপা তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?

কর।

আমি তো ছোট, কিন্তু এমন যদি হয় যে আমার উপর একটা দায়িত্ব আছে যেটা বড়দের দায়িত্ব কিন্তু যেটা শুধু আমি করতে পারি— আমি এবং আমার মত আরো কেউ— মানে— ইয়ে—

অরু আপা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আর হঠাৎ করে আমার মুখে কথা জড়িয়ে গেল। আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম, অরু আপা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি বলছিস? দায়িত্ব? কি দায়িত্ব?

না মানে ইয়ে—

বল কি বলছিস? খুলে বল।

না কিছু না। আমি চুপ করে গেলাম।

অরু আপা ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে শুরু করল। পুরো পরিকল্পনাটা কেমন সুন্দর করে গুছিয়ে এনেছিলাম এখন মনে হচ্ছে ভেস্তে যাবে। বোকার মত একটা কথা বলে কি ঝামেলা করে ফেললাম। অরু আপা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, শোন, যদি ভেবে থাকিস তুই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ স্বাধীন করবি— সেটা ভুলে যা। সেটার চেষ্টা করে শুধু নিজেদের বিপদে ফেলবি না যারা সত্যিকার মুক্তিবাহিনী তাদেরকেও বিপদে ফেলবি। তোরা এখন বাচ্চা— একেবারে বাচ্চা।

আমি প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম, না না আমি মুক্তিবাহিনীতে যাবার কথা বলছি না।

হ্যাঁ! বলিস না। একদিন দেশ স্বাধীন হবে তখন দেশের জন্যে কাজ করার অনেক সুযোগ পাবি।

আমি মাথা নাড়লাম। হ্যাঁ পাব।

মন দিয়ে পড়াশোনা কর। ট্রানশ্লেশান কর, দেশের কাজ হবে। কোন রকম পাগলামী করিস না।

না করব না।

অরু আপা বাসা থেকে বের হয়ে আসি খুব সাবধানে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

১০.

রাত বেশি হয় নি, মাত্র আটটা বাজে কিন্তু এর মাঝে কি অন্ধকার। আমি আর রাশেদ সেই অন্ধকারেই গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছি। বাজারের কাছে এসে খানিকক্ষণ একটা দোকানের পাশে লুকিয়ে থাকতে হল, কয়েকটা রাজাকার যাচ্ছিল কথা বলতে বলতে। নদীর কাছে এসে আমাদের মাঠে নেমে যেতে হল, বড় ব্রীজটার দুই পাশে এখন মিলিটারী পাহারা। রাত্রিবেলা কেউ এখন ব্রীজটা পার হতে পারে না। দিনের বেলাতেই মিলিটারীরা দাঁড় করিয়ে হাজার রকম প্রশ্ন করে একটু সন্দেহ হলেই নদীর তীরে নিয়ে গুলী করে মেরে পেলে। লোকজন কেউ এখন আর ব্রীজ দিয়ে পার হয় না নৌকা করে পার হয়।

রাশেদ মনে হয় এলাকাটা বেশ ভাল করে চিনে। মাইলখানেক অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এল, নদীতে অনেকগুলি নৌকা সেখানে কাছাকাছি রাখা। রাশেদ এদিক সেদিক তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকল, হানিফ ভাই —

কে?

আমি রাশেদ।

এই যে এদিকে।

আমরা হাতড়ে হাতড়ে নৌকাটাতে উঠে পড়ি। নৌকার মাঝি বলল, আর কেউ কি আসবে?

হানিফ নামের মানুষটা বলল, না। চল ও পাড়ে।

মাঝি লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটা ছেড়ে দিল। হানিফ নামের মানুষটা বলল, তোমার সাথে কে?

আমার বন্ধু ইবু। আপনাকে বলেছিলাম, মনে নাই?

ও।

হানিফ মানুষটা মনে হয় বেশি কথা বলতে পছন্দ করে না। নৌকায় বসে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল, ওমনা মনারে আমার ছাইড়া তুমি কই গেলা রে . . .

গলায় সুর নেই আর গানের কথাগুলিরও কোন অর্থ নেই কিন্তু হানিফ আপন মনে গান গেয়ে যেতে থাকল। অন্ধকারে, নদীর ঠাণ্ডা বাতাসে, নৌকার দুলুনীতে একটু পর গানটা আমার বেশ ভালই লাগতে থাকে।

আমি গলা নামিয়ে রাশেদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি মুক্তিবাহিনী?

না, মুক্তিবাহিনীর লোক।

ও।

নদীর ওপারে নেমে আবার আমরা হেঁটে যেতে থাকি। অনেক দূর হেঁটে আমরা গাছপালা ঢাকা একটা ছোট বাড়িতে হাজির হলাম। রাস্তায় একটা কুকুর ঘেউঘেউ করতে থাকে আর একজন মানুষ রাগ-রাগ গলায় জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি হানিফ।

কোন হানিফ?

চাঁদনী বাজারের।

রাশেদ আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, গোপন পাশওয়ার্ড।

অন্ধকার থেকে মানুষটা এবারে বের হয়ে এল, হাতে আলগোছে একটা রাইফেল ঝুলিয়ে রেখেছে। বলল, আস ভিতরে। সাথে এই বাচ্চা কারা?

যার কথা বলেছিলাম।

একেবারে বাচ্চা ছেলে দেখি!

ভিতরে একটা হারিক্যান জ্বালিয়ে বেশ কিছু মানুষ বসে আছে। কয়েকজন তাস খেলছে বিছানায় বসে। হারিক্যানের অল্প আলোয় চকচক করছে কয়েকটা স্টেনগান।

চশমা পরা একজন বলল, হানিফ কি খবর তোমার।

ভাল। মিলিটারী ক্যাম্পের ম্যাপ যারা তৈরি করেছে তাদের নিয়ে এসেছি।

আরে! এ দেখি দুধের বাচ্চা! চশমা পরা মানুষটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, কাছে আস, কাছে আস।

আমরা কাছে গেলাম, চশমা পরা একজন মানুষ আমাদের মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলি এলোমেলো করে দিয়ে বলল, ম্যাপ দেখে আমি ভেবেছিলাম তোমরা আরো বড় হবে। ফার্স্ট ক্লাস একটা ম্যাপ। এত সুন্দর ম্যাপ তৈরি করা শিখলে কেমন করে?

রাশেদ বলল, শিখি নাই! আন্দাজে আন্দাজে করেছি। আমি বললাম, আমরা যখন গুপ্তধন খেলতাম তখন ম্যাপটা তৈরি করেছিলাম। আমাদের সাথে আশরাফ নামের একজন আছে সে বিল্ডিংগুলি, ক্লাশ ঘর, পুকুর, গাছ এই সব এঁকেছে।

আর মিলিটারী ক্যাম্পে এখন কোনটা কি—

সেগুলো রাশেদ করেছে।

চশমা পরা মানুষটা আবার অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আস্তে আস্তে বলল,

সাংঘাতিক একটা কাজ করেছ তোমরা। সাংঘাতিক কাজ! কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তোমরা আরো বড় হবে। স্কুলে নাইন টেনে পড়ে এরকম বেশ বড় বড় ছেলে আছে তো সেরকম। কিন্তু তোমার এত ছোট জানলে কিছুতেই আসতে বলতাম না। কিছুতেই না। তোমাদের বাসায় চিন্তা করবে না?

আমি ইতস্ততঃ করে মাথা নাড়লাম, না।

কেন?

বাসায় জানে না।

জানে না? চশমা পরা মানুষটা মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, যাই হোক যা হবার হয়েছে। আমাকে তোমরা কাজল ভাই বলে ডাকতে পার।

কাজল ভাই?

হ্যাঁ। আমার আসল নাম কিন্তু কাজল না। আমরা একটা স্পেশাল মিশনে এসেছি, আসল নাম বলা নিষেধ। কাজল নামটা আমার খুব পছন্দ। তাই এখন আমার নাম কাজল ভাই।

গোঁফওয়ালা একজন তার গোঁফ টানতে টানতে বলল, আমার মাঝে মাঝে মনে থাকে না, তখন কাজল না ডেকে সুরমা ডেকে ফেলি।

কাজল ভাই হো হো করে হেসে বললেন, ধুর। সুরমা তো মেয়েদের নাম।

আরেকজন হঠাৎ মাথা নেড়ে গান গেয়ে উঠল, চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কি হবে . . .

সবাই আবার হো হো করে হেসে উঠে। কাজল ভাই ঘড়ি দেখে বললেন, দুই নম্বর দলটা তো এখনো এল না ওদের জন্যে অপেক্ষা করব না কি শুরু করে দেব?

কালোমতন একজন তার গোঁফ টানতে টানতে বলল, নদীতে গান বোটের বড় উৎপাত, অনেক সময় লাগে পার হতে। তার ওপর বড় রাস্তায় মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে সোজাসুজি আর আসা যায় না দুনিয়া ঘুরে ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়।

ফর্সা মতন একজন বলল, গুলীর বাক্স মাথায় নিয়ে।

গ্রামের লোকজন অবশ্য সাহায্য করে।

তা করে। না হলে উপায় ছিল?

কাজল ভাই বললেন, আমরা তাহলে ওদের ছাড়াই শুরু করে দেই।

হ্যাঁ, শুরু করেন।

কাজল ভাই পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে সামনে রেখে হারিক্যানটা উসকে দিলেন। আমরা মাথা উঁচু করে দেখলাম আমাদের আঁকা স্কুলের ম্যাপটা। রাশেদ চোখ বড় বড় করে বলল, আমাদের ম্যাপ।

হ্যাঁ, কাজল ভাই এক গাল হেসে বললেন, এখন বলা যায় সোনার খনি।

কাজল ভাই ম্যাপটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এটা কি স্কেল মত আঁকা হয়েছে। এক ইঞ্চি সমান দশ গজ এইটা কি সত্যি?

হ্যাঁ। আমি মাথা নাড়লাম, আশরাফ গ্রাফ পেপারে এঁকেছিল, হেঁটে হেঁটে মেপেছে সবকিছু।

ভেরি গুড। কাজল ভাই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, এই যে লাইব্রেরি ঘর স্কুল থেকে একটু আলাদা, এখানে লিখেছ মূল অস্ত্রাগার। এটা কি সত্যি?

রাশেদ মাথা নেড়ে বলল, সত্যি।

কেমন করে জান?

আমি দেখেছি।

কি দেখেছ?

দেখেছি মিলিটারীগুলি অপারেশন শেষ করে এসে সব অস্ত্র এখানে জমা দেয়। গুলীর বাক্সগুলি এনে এখানে রাখে।

সব সময় কয়জন পাহারা থাকে এখানে। যারা মাথায় গুলীর বাক্স নিয়ে গেছে তারা বলেছে ভিতরে নাকি শুধু মেশিন গান আর মেশিন গান।

কাজল ভাই লাল পেন্সিল দিয়ে লাইব্রেরিটা ঘিরে একটা দাগ দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এর দরজা কোন দিকে?

আমরা দেখিয়ে দিলাম, এদিকে আছে ওদিকেও আছে।

ফর্সা মতন ছেলেটা জিব দিয়ে চুকচুক করে বলল, এদিকে হলে ভাল হত।

কাজল ভাই বললেন, হ্যাঁ। তবে এটা বড় সমস্যা না।

সবাই পুকুরটা নিয়ে খানিকক্ষণ কথা বলল, কাজল ভাই এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পারবে এই পুকুরের ঢালুতে যদি কেউ শুয়ে থাকে তাহলে কি স্কুলের দোতলা থেকে দেখা যায়?

না। আমি আর রাশেদ একসাথে মাথা নাড়লাম।

কেমন করে জান?

আমরা লুকোচুরি খেলার সময় মাঝে মাঝে এখানে লুকাই, তখন দেখেছি।

তার মনে পুকুরের ঢালুতে কেউ থাকলে ছাদে যে ব্যাংকার করেছে সেখান থেকে দেখা যাবে না?

না।

গুড। কাজল ভাই খুশি খুশি মুখে পুকুরকে ঘিরে কয়েকটা ক্রস এঁকে বললেন, গুড এখান থেকে কভার দিলে পুরোটা নিরাপদ। দুইটা এস. এম. জি. হলেই পুরোটা কভার হয়।

সবাই মাথা নাড়ল।

গোঁফওয়ালা ছেলেটা বলল, এই পুরো জায়গার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এই বাংকার।

মর্টার দিয়ে চেষ্টা করা যায় না?

না। কাজল ভাই মাথা নাড়লেন, কাছে বাড়িঘর দোকানপাট। পাবলিক মারা পড়বে।

রাশেদ বললেন, ছাদের বাংকারে মিলিটারী থাকে না। শুধু দরকারের সময় উঠে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করে তখন দৌড়ে গিয়ে ছাদে উঠে। তা ছাড়া এখন বর্ষার সময়, বাংকারে ভাল ছাদ নাই, কেউ থাকে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, তা ছাড়া মিলিটারীরা জোঁককে খুব ভয় পায়। বর্ষার সময় এই দিকে অনেক জোঁক। আর—

আর কি?

আমাদের স্কুলের দোতলা এখানে শেষ হয় নাই। সিড়িটা খোলা, এই দিক দিয়ে গেছে। রাশেদ ম্যাপে হাত দিয়ে সিড়িটা দেখিয়ে বলল, এই সিঁড়ি দিয়ে বাংকারে যেতে হয়।

কাজল ভাই ভুরু কুচকে রাশেদের দিকে তাকালেন। রাশেদ বলল, রাস্তার এই পাশে কেউ যদি একটা স্টেনগান না হয় মেশিন গান নিয়ে বসে থাকে, যদি সিঁড়ির দিকে গুলী করতে থাকে তাহলে কেউ সিঁড়ি দিয়ে ছাদে যেতে পারবে না।

কাজল ভাই একটু অবাক হয়ে রাশেদের দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, রাস্তার এই পাশে কি আছে?

নূর মোহাম্মদের বেকারী। রুটি তৈরি করে। এই পাশে উত্তম লন্ড্রী। এইখানে আরেকটা চায়ের দোকান।

এটা ইটের দালান?

হ্যাঁ।

তুমি শিওর?

শিওর।

এখান থেকে সিড়িটা কভার করা যাবে?

যাবে।

কাজল ভাই এবং অন্যেরা ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে নানারকম কথা বলতে শুরু করলেন কি একটা ব্যাপার নিয়ে দুজনের খানিকক্ষণ তর্কও হল। কাজল ভাই একসময় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মনে হয় এই লোকেশানটা একটা এটাকের জন্যে খুব ভাল। খুব সুন্দর পজিশান দেওয়া যাবে। আমার ইচ্ছা অস্ত্রাগার থেকে কয়টা রকেট লঞ্চার নেওয়া। খুব অভাব রকেট লঞ্চারের। যদি নেওয়া না যায় ঘরটা উড়িয়ে দেওয়াও খারাপ না।

ফর্সা মতন ছেলেটা বলল, কিন্তু গ্রেবাল প্ল্যানের তো রদবদল করা যাবে না। প্রাইমারী মিশন হচ্ছে জিরো প্লাস টুয়েন্টি ফোর আওয়ারে—

না। প্রাইমারী মিশন তো রদবদল করছিও না। এই অপারেশনটা দুই নম্বর দলের জন্য। সব লোকাল ছেলেরা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রাইমারী মিশনটা কি?

কাজল ভাই হেসে বললেন, এটা একটা টপ সিক্রেট অপারেশান, কাউকে বলার কথা না। কখন হবে কোথায় হবে কেউ জানে না। খুটিনাটি সব কিছু শুধু আমি জানি।

কালো মতন গোঁফওয়ালা ছেলেটা বলল, আমাদের উপর কি অর্ডার আছে জান?

কি?

যদি হঠাৎ আমার কোন কারণে মিলিটারীদের হাতে ধরা পড়ে যাই তাহলে নিজেরাই যেন প্রথমে কাজল ভাইকে গুলী করে মেরে ফেলি! ধরা পড়ার পর অত্যাচার করে যেন কিছু বের করতে না পারে।

রাশেদ চোখ কপালে তুলে বলল, গুলি করে মেরে ফেলবেন? কাজল ভাইকে?

কাজল ভাই চোখ বড় বড় করে বললেন, ধরা পড়লে! ধরা পড়লে! ধরা পড়ার আগে না—

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ফর্সা ছেলেটা বলল, প্রথম প্রথম যেসব যুদ্ধ হয়েছে সেগুলি ছিল কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়া। এখন সব কিছু বড় পরিকল্পনার মাঝে হচ্ছে। সারা দেশকে এগারোটা সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। একেকটা সেক্টরের দায়িত্বে আছে —

হঠাৎ বাইরে থেকে শীষের মত একটা শব্দ হল সাথে সাথে ভিতরে সবাই চুপ করে গেল। কাজল ভাই আস্তে করে হারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিছানা থেকে একটা স্টেনগান হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। ফর্সা মতন ছেলেটা আমাকে আর রাশেদকে ফিসফিস করে বলল, মাটিতে শুয়ে পড়।

আমরা মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। উত্তেজনায় আমার বুক ধ্বকধ্বক করে শব্দ করছে, তার মাঝে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকলাম। বাইরে কিছু মানুষের পায়ের শব্দ পেলাম কিছু কথাবার্তা শোনা গেল তারপর আবার চুপচাপ। আবার শীষের শব্দ শোনা গেল, এবার দু'বার। তখন সবাই আবার আস্তে আস্তে কথা বলতে শুরু করল। কাজল ভাই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন সাবধানে।

ফর্সা মতন ছেলেটা বলল, রাজাকাররা মনে হচ্ছে খুব উৎপাত করছে।

একটা ব্রাশ ফায়ার করে জানিয়ে দিলে হয় আমরা এখানে তাহলে আর ধারে কাছে আসবে না!

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা রাতে মুক্তিবাহিনীর সাথে ভাত খেলাম। খাবার বেশি কিছু ছিল না মোটা লাল চাউলের ভাত আর ডিম। সবাই সেটা এত মজা করে খেল যেন কোরমা পোলাও

খাচ্ছে। খাবার পর চা, চিনি নাই বলে গুড় চা। খেতে কেমন জানি পায়েশ পায়েশ মনে হয়। খাবার পর মেঝেতে মাদুর পেতে দুটি তেল চিটচিটে বালিশ দিয়ে কাজল ভাই বললেন, তোমরা এখন ঘুমাও। সকালে তোমাদের শহরে পৌঁছে দেয়া হবে।

রাশেদ বলল, আমাদের এখন ঘুম পায় নাই।

না পেলেও ঘুমাতে হবে। মনে কর এটা হাই কমান্ডের অর্ডার।

আমরা তখন শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে রাশেদ আর আমি ফিসফিস করে কথা বলতে থাকি। এই প্রথম সত্যিকারের মুক্তিবাহিনী দেখছি! কি সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমরা চুপচাপ শুয়ে রইলাম। উত্তেজনায় চোখে ঘুম আসতে চায় না। বাইরে একটা কুকুর ডাকছে। দূরে কোথায় যেন একটা শেয়াল ডাকছে, রাতে শেয়ালের ডাক বুকের ভিতর কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কারণটা কি কে জানে! আরো দূরে কোথায় জানি গুলীর শব্দ হল। কে জানে ব্রীজের উপর মিলিটারীগুলি কাউকে গুলী করে মারছে কি না।

আমার মনে হল কখনো ঘুম আসবে না। কিন্তু শুয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সত্যিই ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম আমিও মুক্তিবাহিনী। বিশাল একটা মেশিনগান নিয়ে আমি কাদার মাঝে দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে যাচ্ছি। একেবারে সত্যি মুক্তিবাহিনীর মত।

১১.

গভীর রাতে আমাকে কে যেন ডেকে তুলল, ইবু, এই ইবু ওঠ! দেখ কে এসেছে!

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। রাশেদ আরেকবার আমাকে ঝাঁকিয়ে বলল, দেখ ইবু, দেখ।

হারিক্যানের আবছা আলোতে আমার সামনে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা চুল মুখে খোচা খোচা দাড়ি। মাথায় একটা গামছা বাঁধা। পরনে খাটো একটা লুঙ্গি কিন্তু পায়ে সবুজ রঙের বুট। আমি আবার ভাল করে তাকালাম তখন হঠাৎ করে চিনতে পারলাম, শফিক ভাই!

শফিক ভাই আমাকে আর রাশেদকে এত শক্ত করে ধরলেন যে ছাড়তেই চান না। খানিকক্ষণ পর বললেন, এখন দেখো তো তোমরা একে চিনতে পারো কি না। আগেই দেখো না, চোখ বন্ধ করে রাখো।

আমি আর রাশেদ চোখ বন্ধ করে রাখলাম, বুঝতে পারলাম সবাই মিলে একজনকে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করাল। তারপর শফিক ভাই রহস্য করে বললেন, ঠিক আছে এখন চোখ খুলো।

আমরা তাকালাম, আমাদের সামনে কাদের দাঁড়িয়ে আছে। খাটো করে লুঙ্গি পরা, কোমরে গামছা হাতে একটা রাইফেল।

কাদের ! তুই !

আমি আর রাশেদ ছুটে কাদেরকে এত জোরে ধরলাম যে সে একেবারে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সাথে আমরাও।

কাদের বলল, আর কি করিস ! কি করিস ! ছাড়, ছাড় আমাকে। ছাড় বলছি— ভাল হবে না।

আমরা কাদেরকে ছাড়ি না। আমাদের ক্লাসের ছেলে কিন্তু কখনো কাদেরের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয় নি— কিন্তু হঠাৎ মাঝরাতে হারিক্যানের আবছা আলোতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমাদের কি গভীর একটা ভালবাসা হয়ে গেল। কাদের বলল, ছাড় ! ছাড় আমাকে ! ভাল হবে না বলছি— একেবারে ব্রাশ ফায়ার করে দেব।

আমরা তবুও কাদেরকে ছাড়ি না, কোন কথা বলতে পারি না শুধু বলি, তুই কাদের তুই ! তুই !

আমাদের ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমরা কাদেরকে ছাড়লাম। কাদের উঠে দাঁড়িয়ে শরীর থেকে ধুলা ঝেড়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। কাদেরকে দেখতে কেমন বড় মানুষের মত দেখাতে থাকে। আর আমি রাশেদ কাদেরকে প্রশ্ন করা শুরু করলাম।

তুই সত্যি সত্যি মুক্তিবাহিনীতে গেছিস ?

কেমন করে গেলি ?

তোকে নিল ?

আমরাও যাব তাহলে !

আমাদেরকে কি নেবে ?

যুদ্ধ করেছিস তুই ?

সত্যি সত্যি যুদ্ধ ?

কাদের কথা না বলে বড় মানুষের মত হাসে। আমরা যখন বললাম আমরাও মুক্তিবাহিনীতে যাব তখন মাথা নেড়ে বলল, তোরা বেশি ছোট, তোদের নেবে না।

তাহলে তোকে যে নিল ?

আমি এতবার পরীক্ষায় ফেল করেছি বলে তোদের সাথে এক ক্লাসে। না হলে আমার এতদিনে কলেজে যাবার কথা !

ধুর মিথ্যুক কোথাকার।

তোর তো মুক্তিবাহিনীতে আছিসই। কাজল ভাই বলেছেন তোরা নাকি সাংঘাতিক নিখুঁত একটা ম্যাপ তৈরি করছিস। মিলিটারী ক্যাম্পের ম্যাপ। তোদের ম্যাপ দিয়ে একটা অপারেশান হবে। হবে না ?

আমরা মাথা নাড়লাম।

তাহলে ? কাদের আস্তে আস্তে বলল, বড় কষ্ট মুক্তিবাহিনীতে। খাওয়ার কষ্ট, ঘুমের কষ্ট, থাকার কষ্ট। এই জুতা পরে কাদার মাঝে হাঁটতে হাঁটতে পায়ের মাঝে ঘা

হয়ে গেছে। মাথার মাঝে উঁকুন এই বড় বড়, বিশ্বাস করবি না। দুই দিন তিন দিন হয়ে যায় ভাত খাই না, খালি শুকনা চিড়া। আর একেকটা গুলীর বাক্স যে কি ভারি তোদেরকে বোঝাতে পারব না।

কাদের হঠাৎ একটু হেসে বলল, কিন্তু যখন গ্রামের মানুষেরা আমাদেরকে দেখে তখন এত যত্ন করে তোরা বিশ্বাস করবি না। সেদিন একজন বুড়ি আমাকে ধরে হাউ-মাউ করে কান্না, বলে বাবা এই ছোট কেন যুদ্ধ করতে যাও, তুমি আমার সাথে থাক, আমার কোন ছেলে পুলে নাই। আমার ছেলে তুমি আমার ধন!

তাই বলল?

হ্যাঁ। আমরা যদি কোন গ্রামে থাকি তখন গ্রামের মানুষ গরু জবাই করে খাওয়ায়। কিন্তু নিষেধ আছে আমাদের।

নিষেধ?

হ্যাঁ। কারো বাড়িতে খেলে জানাজানি হবে, পরে খবর পেয়ে মিলিটারী এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

হঠাৎ কাদেরের কিছু একটা মনে পড়ল। চোখ বড় বড় করে বলল, আমরা তো একটা রাজাকার ধরে এনেছি!

রাজাকার ধরে এনেছিস?

হ্যাঁ কদমতলার পুলের নিচে পাহারা দিতে দিতে শালার ব্যাটা ঘুমিয়ে গেছে আমরা চুপি চুপি গিয়ে পিছন থেকে চেপে ধরে ফেলেছি। তারপর পিছমোড়া করে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছি।

চোখ বেঁধে?

হ্যাঁ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করবে এখন?

কাদের উদাস ভঙ্গি করে বলল, মেরে ফেলবে মনে হয়।

মেরে ফেলবে? আমি আতংকে একেবারে চমকে উঠলাম।

মনে হয়।

তু-তু-তুই মানুষ মারতে দেখেছিস?

দেখেছি। উল্লাপুর গ্রামের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানকে মারল যখন আমি কাছে ছিলাম। কাদের শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেলে বলল, এক নম্বর দালাল।

তুই কখন কাউকে মেরেছিস?

কাদের কোন উত্তর না দিয়ে পা দিয়ে মাটি খুটতে থাকে, তারপর নিচু গলায় বলে, জানি না। যুদ্ধের ব্যাপার। কার গুলীতে কি হয়, কে কখন মারা যায় কেউ জানে না। কিছু বলা যায় না। চরের ওদিকে কয়েকবার এমবুশ করেছি তো।

কাদের হঠাৎ সুর পাল্টে বলল, আয় দেখি রাজাকার শালা কি করে।

আমরা কাদেরের সাথে সাথে বাইরে এলাম। ওঠানে কাছে একটা গাছের সাথে

একটা মানুষ দড়ি দিয়ে বাঁধা। মানষটা কুঁজো হয়ে বসে আছে, হাত দুটি পিছনে শক্ত করে বেঁধে রাখা। চোখ দুটিও একটা গামছা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কাছে একটা কুপী বাতি জ্বলছে। কুপী বাতির অস্পষ্ট আলোতে এই মানুষটির একদম কুঁজো হয়ে বসে থাকার দৃশ্যটি দেখে আমার কেন জানি গায়ে কাটা দিয়ে উঠল।

কাদের কাছে গিয়ে ডাকল, এই শালা।

রাজাকারটি কোন কথা বলল না।

এই শালা পাকিস্তানের দালাল।

রাজাকারটি তবু কোন কথা বলল না। কাদের তখন একটু এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে মাথায় ধাক্কা দিয়ে বলল, শুওরের বাচ্চা হারামখোর কথা বলিস না কেন? দেব রাইফেলের বাট দিয়ে একটা?

কাদের সত্যি রাইফেলের বাট দিয়ে তার মাথায় দিত কিনা জানি না কিন্তু ঠিক তখন দেখলাম কাজল ভাই এবং আরো কয়েকজন হেঁটে আসছেন। কাছে এসে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, একে খুলে দাও দেখি। যেভাবে বাঁধা হয়েছে ব্লাড সার্কুলেশন তো বন্ধ হয়ে যাবে।

একজন একটু অবাক হয়ে বলল, খুলে দেব?

হ্যাঁ। একটু কথা বলি।

তারপর কি গুল্লী?

কাজল ভাই কোন উত্তর দিলেন না।

রাজাকারটির চোখ খুলে হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেবার পর সে তার হাতের কব্জিতে বুলাতে বুলাতে ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে তাকাল। একেবারে গ্রামের একজন মানুষ। মুক্তিবাহিনীর একটা ছেলের সাথে চেহারার কোন পার্থক্য নাই। কাজল ভাই একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো তোমার নাম কি?

লোকটা অস্পষ্ট গলায় বলল আফজাল।

আফজাল?

জ্বী।

আফজাল তুমি কি জান পাকিস্তানী মিলিটারী এদেশে কি করেছে?

রাজাকারটি কোন উত্তর দিল না।

কাজল ভাই গলার স্বর উচু করে বললেন, জান?

জানি।

কি করেছে?

বাড়িঘর জ্বালিয়েছে।

আর কি করেছে?

খুন খারাপী করেছে।

কত খুন খারাপী করেছে।

রাজাকারটি কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল। কাজল ভাই ধমক দিয়ে বললেন, কত জন খুন খারাপী করেছে?

অনেক।

তাহলে তুমি কেন ওদের সাথে যোগ দিলে?

রাজাকারটি মুখ তুলে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কাজল ভাই বললেন, কি বলবে, বল।

হাজী সাহেব বললেন রাজাকারের যোগ দিতে। ভাল বেতন। আমি মূর্খ মানুষ এত কিছু বুঝি না—

তাই গিয়ে রাজাকারে যোগ দিলে? চোখ খুলে দেখলে না কার দলে যোগ দিচ্ছ?

রাজাকারটি মাথা নিচু করে বসে রইল।

তুমি কিছু বুঝ না, মূর্খ মানুষ, কিন্তু দেশ তো বুঝো।

রাজাকারটি মাথা নাড়ল।

দেশের মানুষ বুঝ?

বুঝি।

তুমি তোমার দেশ আর সেই দেশের মানুষের সাথে বেঈমানী করেছ। দেশের সাথে বেঈমানী করতে তার শাস্তি কি জান?

রাজাকারটি কোন কথা বলল না, কাজল ভাই হঠাৎ গর্জন করে উঠলেন, জান শাস্তি কি?

রাজাকারটি এবারে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। বয়স্ক মানুষকে কাঁদতে দেখলে খুব খারাপ লাগে। সেদিন আজরফ আলীকে কাঁদতে দেখেছিলাম আজ একে দেখলাম। আমার কেমন জানি গা শির শির করতে থাকে।

কাজল ভাই আবার চিৎকার করে বললেন, কি হল কথার উত্তর দাও না কেন? বল।

রাজাকারটি তবুও কোন উত্তর দিল না, দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কাঁদতে থাকে। কাজল ভাই অনেকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ গলার স্বর নরম করে বললেন, আফজাল—

লোকটা আস্তে আস্তে মাথা তুলে কাজল ভাইয়ের দিকে তাকাল, বলল, জ্বী।

উঠ।

লোকটা যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না কাজল ভাই কি বলছেন। বসে অবাক হয়ে কাজল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কাজল ভাই একটু এগিয়ে গিয়ে তার হাতে ধরে টেনে তুললেন, বললেন, তোমার কোন ভয় নাই। তোমাকে আমার কিছু করব না।

লোকটা অবাক হয়ে কাজল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল, দেখে মনে হল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তুমি রাজাকারে যোগ দিয়েছ সেইটা দেশের সাথে— দেশের মানুষের সাথে,

অনেক বড় বেঈমানী। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি— তুমি না বুঝে গিয়েছ। তুমি ভুল করেছ, অনেক বড় ভুল। ভুল করলে সুযোগ দিতে হয়। আমরা তোমাকে আবার সুযোগ দিব। তোমাকে ছেড়ে দেব—

রাজাকারটি হঠাৎ মাটিতে পড়ে কাজল ভাইয়ের পা চেপে ধরে বলল, আমি যাব না। আমি আপনাদের সাথে থাকব। আমাকে মুক্তিবাহিনীতে নেন—

কাজল ভাই লোকটিকে টেনে তুলে বললেন, ছিঃ, কারো পা ধরতে হয় না।

আমি হাজী সাহেবের টুটি ছিঁড়ে আনব—

না—না—না। কারো টুটি ছিড়তে হবে না। আফজাল আমরা নিজের দেশের মানুষ মারতে আসি নাই। সেটা পাকিস্তানীরা করছে। আমার দেশকে বাঁচাতে এসেছি—

লোকটি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জান দেব স্যার আপনাদের জন্যে। জান দেব। দেশের জন্যে জান দেব। খোদার কসম। আল্লাহর কসম।

ভেরী গুড। কাজল ভাই লোকটার পিঠে হাত দিয়ে বললেন। দরকার হলে দেশের জন্যে জান দিও। আল্লাহ খুশি হবে। নিজের দেশকে ভালবাসা হচ্ছে ঈমানের অংশ। যে দেশকে ভালবাসে না সে হচ্ছে বেঈমান। যত নামাজ পড়ুক রোজা রাখুক সে তবু বেঈমান। বেঈমানের জায়গা হচ্ছে জাহান্নামে।

কাজল ভাই একজনকে বললেন, আফজালকে কিছু খেতে দাও। আজকের দিনটা থাকুক আমাদের সাথে। কাজকর্ম একটু দেখুক। তারপর চলে যেতে দিও।

আমি যাব না স্যার। যাব না। থাকব আপনাদের সাথে

থাকতে চাইলে থাকবে। কিন্তু আগে তোমাকে তোমার গ্রামে ফিরে যেতে হবে। তোমার সাথে আর যারা রাজাকারে যোগ দিয়েছে সবাইকে বলতে হবে তারাও যেন মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ঠিক আছে?

লোকটা বাধ্য মানুষের মত মাথা নাড়ল।

যাও এখন কিছু খাও।

কয়েকজনের সাথে আফজাল ভিতরের দিকে চলে যাবার পর কাজল ভাই গলা নামিয়ে বললেন, খুব চোখে চোখে রাখবে। কথাবার্তাও খুব সাবধান, কোন রকম খবরা-খবর যেন না পায়। সবাইকে বল যেন খুব ভাল ব্যবহার করে।

তাই বলে একটা রাজাকারকে—

একটা রাজাকারকে যদি দলে আনতে পার ডাবল লাভ।

তা ঠিক।

আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে, রাজাকারদের বুঝিয়ে দিলে তারা মুক্তিবাহিনীতে এসে যায়। পরীক্ষা করে দেখি না ব্যাপারটা সত্যি কি না। তবে খুব সাবধান। যখন ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে, আবার চোখ বেঁধে নিয়ে যাবে।

চোখ বেঁধে?

হ্যাঁ, যদি বিট্রে করতেও চায় কোন কিছু যেন করতে না পারে।

কি মনে হয় আপনার, বিট্রে কি করবে?

মনে হয় না। নিজের দেশের সাথে বেঈমানী করবে এরকম মানুষ আর কয়জন আছে বল!

কাজল ভাই এবারে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো পিচ্চি মুক্তিযোদ্ধা? চা হবে নাকি এককাপ?

আমার মাথা নাড়লাম।

চল তাহলে। চা খেয়ে দেখো আবার ঘুমানো যায় কি না। সকালে তোমাদের পৌঁছে দিতে হবে।

কাদের মৃদু স্বরে বলল, সকাল তো দেখি হয়েই যাচ্ছে। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যি সত্যি অন্ধকার কেটে আলো হয়ে আসছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভোররাতের ঠাণ্ডা বাতাসে হঠাৎ আমার কি ভালই না লাগল।

আহা। এই দেশ যখন স্বাধীন হবে কি আনন্দই না হবে। কেন জানি আমার চোখে পানি এসে গেল।

১২.

ভোর বেলা পা টিপে টিপে বাসায় ফিরে যাচ্ছিলাম। হানিফ একটু আগে আমাদের বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে গেছে। অরু আপার বাসার কাছে আসতেই জানালার কাছে থেকে অরু আপা তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, ইবু।

আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। অরু আপা পাথরের মূর্তির মত জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে দেখে হঠাৎ আমার কেমন জানি ভয় লাগতে থাকে। অরু আপা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এদিকে আয়।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, অরু আপা, একটা ব্যাপারে আমার মানে এখনই বাসায়—

অরু আপা ভয়ংকর মুখে তীব্র স্বরে বললেন, এদিকে আয়।

আমি এগিয়ে গেলাম। অরু আপা দরজা খুলে দিলেন। আমি ভিতরে যেতেই খপ করে আমার হাত ধরলেন। এত জোরে ধরলেন যে আমার হাত ব্যথা করতে থাকে। অরু আপা আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, কাল রাতে কোথায় ছিলি?

আমি চমকে উঠে মাথা নিচু করলাম। সর্বনাশ হয়েছে, ধরা পড়ে গেছি।

কোথায় ছিলি?

আমি চুপ করে রইলাম। অরু আপা ধমকে উঠলেন, কোথায় ছিলি?

অরু আপা আমি তোমাকে বলতে পারব না।

তোকে বলতেই হবে, অরু আপা হিংস্র গলায় বললেন, না হলে তোকে আমি খুন করে ফেলব। খুন করে ফেলব।

অরু আপাকে দেখে মনে হল সত্যি আমাকে খুন করে ফেলবেন। আমি কোন রকমে বললাম, অরু আপা—

তুই জানিস সারারাত আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি? সারারাত। তুই জানিস? জানিস?

অরু আপা —

তোর বাসার সবাই জানে তুই এখানে। আমি জানি তুই পালিয়ে গেছিস বাড়ি থেকে। কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি কাল রাতে?

অরু আপা, আমি বলতে পারব না।

বলতেই হবে তোকে। অরু আপা আমার হাতে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে ব্যাথায় চোখের পানি এসে গেল। ভয়ংকর চেহারা করে বললেন, এখন আমাকে বলতেই হবে। বলতেই হবে—

অরু আপা—

বলতেই হবে তোর। বলতেই হবে। কোথায় ছিলি কাল রাতে?

অরু আপা আমি বলতে পারব না।

অরু আপা আমাকে ছেড়ে দিলেন। বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, যা। তুই আর কোনদিন আমার কাছে আসবি না। কোন দিন না। যা। বের হয়ে যা।

অরু আপা কখনো আমার সাথে এত কঠিন গলায় কথা বলেননি, আমার চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল। কিন্তু আমি তো কিছুতেই অরু আপাকে সত্যি কথাটি বলতে পারব না। আসার আগে আমি আর রাশেদ কাজল ভাইয়ের গা ছুঁয়ে দেশের নামে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। আমি মাথা নিচু করে চেষ্টা করতে লাগলাম চোখের পানি লুকিয়ে রাখতে। অরু আপা দরজা খুলে বললেন, যা বের হয়ে যা। এই মুহূর্তে বের হয়ে যা।

আমি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে অরু আপার হাতে দিলাম। অরু আপা জিজ্ঞেস করলেন, কি এটা?

তোমার চিঠি। শফিক ভাই দিয়েছে।

শফিক? অরু আপা চমকে উঠে বললেন, শফিক ফিরে এসেছে। দেখা হয়েছে তোর সাথে?

তোমাকে বলতে পারব না অরু আপা। আমরা দেশের নামে প্রতিজ্ঞা করেছি—

তুই— তুই মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করেছিস?

আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

অরু আপা নিচু হয়ে আমার কাছে এসে হঠাৎ আমাকে বুকে চপে ধরে ভাঙা গলায় বললেন, এইটুকুন ছেলে তুই, এখন তোর ঘুড়ি ওড়ানোর কথা, মাঠে বল খেলার কথা, আর তুই কি না মুক্তিবাহিনীর সাথে কাজ করিস? নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে?

তুই? তোর মত বাচ্চা ছেলে? তোর মত বাচ্চা ছেলে?

তারপর হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই। অরু আপা আমাকে শক্ত করে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

অরু আপা যদিও টের পেয়েছিলেন আমি বাসা থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে এসেছি তিনি কাউকে সেটা বলেন নি। আম্মা আব্বা তাই জানতে পারলেন না কিছু। আমি অবিশ্যি খুব সাবধানে থাকলাম সারাদিন, ভুল করে যদি বলে ফেলি, কাল রাতে মশার কামড় খেয়ে— তাহলেই হয়েছে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি বলে দুপুরে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কষ্ট করে জেগে রইলাম সারাদিন।

পরদিন সকালে আমি অভ্যাসমত আমাদের দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসেছি। আব্বা একটু আগে গেছেন। মিলিটারী ঘোষণা দিয়েছে কলেজ খোলা রাখতে। কলেজে কোন ছাত্র নেই তবু আব্বাকে গিয়ে কলেজে বসে থাকতে হয়। আব্বা প্রত্যেকদিন কলেজে যান খুব মন খারাপ করে। ফিরে আসেন আরো বেশি খারাপ করে। মনে হয় আব্বা কয়দিনের মাঝে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাবেন। কোথায় যাবেন এখনো জানি না, মনে হয় দেশের বাড়িতে। রাস্তাঘাট এখনো নিরাপদ নয়, সেটাই সমস্যা।

আমি দেওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে থেকে একটু পরেই বুঝতে পারলাম আজ বুধবার। প্রতি বুধবারে আগে এখানে অনেক বড় বাজার বসত। আশে-পাশের সব এলাকা থেকে নানারকম সওদা নিয়ে লোকজন আসত। বুধবারে বাজারে পাওয়া যেতো না সেরকম জিনিস নেই। মিলিটারী আসার পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহ থেকে মনে হচ্ছে সেটা আবার আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছে। আগের মত এত বড় নয় কিন্তু ছোটখাট একটা বাজার বসছে। আমি দেখলাম লোকজন হাঁস, মুরগী, শাক-সবজী, ডালা কুলো নিয়ে আসছে। মাথায় ফলমূলের বোঝা নিয়ে যাচ্ছে। জুন মাস, এই সকালেই কি সাংঘাতিক গরম। একজন মানুষকে দেখলাম মাথায় একটা ঝাকায় করে কলা নিয়ে যাচ্ছে, ঘামছে দর দর করে। আমার চোখে চোখ পড়তেই লোকটা চোখ সরিয়ে নিল আর আমি হঠাৎ করে চিনে ফেললাম তাকে। কাজল ভাইদের দলে দেখেছি তাকে, একসাথে বসে গুড় দিয়ে চা খেয়েছি আমরা আগের রাতে। মাথায় কলার ঝাকায় শুধু কলা নেই, নিচে নিশ্চয়ই অস্ত্রশস্ত্র। তার মানে মুক্তিবাহিনী মিলিটারী ক্যাম্প আক্রমণ করতে আসছে। উত্তেজনায় আমার বুক ধ্বকধ্বক করে শব্দ করতে থাকে। কখন আক্রমণ করবে? আজ রাতে? একবার ভাবলাম লোকটার পিছু পিছু যাই, দেখি কি করে, কোথায় যায়। কিন্তু গেলাম না, আমাকে যখন না চেনার ভান করেছে আমারও না চেনার ভান করতে হবে।

আমি ছটফট করেত থাকি। রাশেদ যদি আসত তার সাথে কথা বলা যেতো। আজ রাতেই নিশ্চয়ই আক্রমণ হবে। শফিক ভাই কি এসে গেছেন? কাদের? কোথায় আছে কে? নূর মোহাম্মদ বেকারীতে? আমি দেওয়াল থেকে লাফিয়ে নামলাম ঠিক

তখন দেখলাম রাশেদ হেঁটে হেঁটে আসছে। রাশেদের মুখ গম্ভীর। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, রাশেদ জানিস আজ রাতে —

রাশেদ ঠোঁটে আংগুল দিয়ে বলল, শ–স–স–স, আস্তে।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, আজ রাতে ক্যাম্পে অপারেশন হবে।

রাশেদ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, তুই কেমন করে জানিস?

দেখলাম একজন মুক্তিবাহিনী মাথায় কলা নিয়ে যাচ্ছে! নিচে নিশ্চয়ই সব অস্ত্রপাতি।

হ্যাঁ। রাশেদ মাথা নেড়ে বলল, একটা ঝমেলা হয়েছে।

কি ঝামেলা?

শফিক ভাই নূর মুহাম্মদ বেকারীতে চলে গেছে। লাইট মেশিন গান নিয়ে গেছেন একটা। কিন্তু —

কিন্তু কি? নূর মুহাম্মদ পাকিস্তানী?

না না। নূর মুহম্মদ ঠিক আছে। সে খাঁটি জয় বাংলা।

তাহলে?

শফিক ভাই বেশি গুলী নিতে পারেননি। কমপক্ষে এক ঘণ্টার মত গুলী থাকা দরকার। শফিক ভাইয়ের কাছে মাত্র দশ মিনিটের মত আছে।

আরো গুলী পৌঁছে দেয় না কেন?

পারছে না। স্কুলের কাছে কড়া পাহারা বসিয়েছে। দুইটা রাজাকারের চেকপোস্ট। একটাতে আবার কয়টা পাকিস্তানী মিলিটারী বসে থাকে। সব কিছু খুলে খুলে দেখে।

তাহলে?

অন্য সব কিছু রেডী। কিন্তু শফিক ভাইয়ের কাছে গুলী পৌঁছানো না গেলে মনে হয় প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে দিতে হবে। অপারেশানটা নির্ভর করে ছাদের বাংকারটা আটকে রাখার উপর।

তাহলে?

এখনো চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস অবস্থা। রাশেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি একটা জিনিস ভাবছি।

কি?

আমরা শফিক ভাইয়ের কাছে গুলী পৌঁছে দিলে কেমন হয়?

আমরা?

হ্যাঁ আমি আর তুই। ফজলু আর আশরাফ যদি রাজি হয় তাহলে আমরা চারজন।

কিভাবে?

শরীরে গুলীর বেল্টগুলি বেঁধে উপরে শার্ট–প্যান্ট পরে চলে যাব। আমরা ছোট বলে সন্দেহ করবে না। কি মনে হয়?

ফজলু আর আশরাফ কি রাজি হবে?

কেন হবে না?

যদি বলে দেয়?

রাশেদ আমার দিকে চোখ ছোট ছোট করে তাকাল, তুই কি কাউকে বলেছিস আমরা ঐ রাতে কোথায় গিয়েছিলাম?

না। অরু আপা অবিশ্যি জেনে গেছে শফিক ভাইয়ের চিঠি পড়ে।

কিন্তু তুই কি বলেছিস?

না।

তাহলে অন্যেরা কেন বলবে? তুই মনে করিস শুধু তোর দায়িত্ব জ্ঞান আছে অন্যদের নাই? শুধু তুই ভাল মানুষ অন্যরা খারাপ। শুধু তোর মাথায় বুদ্ধি, অন্যেরা বোকা?

আমি কি তাই বলছি নাকি?

তাহলে কি বলছিস?

বলছি যে হাজার হলেও ছোট মানুষ—

ছোট হয়েছি তো কি হয়েছে? বড়রা মনে করে আমরা ছোট বলে কিছু বুঝি না। তুইও জানিস আমিও জানি সেটা ঠিক না। আমরা সব বুঝি। অনেক সময় ভান করি যে বুঝি না কিন্তু ঠিকই বুঝি সবকিছু।

তা ঠিক।

এখন এমন একটা সময় যেটা আগে কখনো হয় নাই। রাশেদ একেবারে বড় মানুষের মত বলল, এরকম সময়ে কি করতে হয় বড়রাও জানে না যে আমাদের বলবে। এখন আমাদের নিজেদের ঠিক করতে হবে কি করব। বুঝলি?

বুঝলাম।

তাহলে চল।

কোথায়।

ফজলু আর আশরাফকে ডেকে আনি।

প্রথমে ফজুলর বাসায় গিয়ে তাকে ডেকে আনলাম। আমাদের দেখে সে খুশি হয়ে বাসা থেকে বের হয়ে এল। বলল, ভাল হল তোরা এসেছিস।

কেন?

বসে বসে লুডু খেলতে খেলতে ভ্যান্দা মারা হয়ে যাচ্ছি। আর শিউলিটা যা চোর! মইয়ের কাছে এলেই চোট্টামী করে মই বেয়ে উঠে যায়। আবার যখন সাপের কাছে আসে —

রাশেদ মেঘ স্বরে বলল, তুই সাপ লুডু খেলিস?

ফজলু থতমত খেয়ে বলল, কেন? খেললে কি হয়?

দেশের এই অবস্থা। আমাদের এত কাজ —

কি কাজ?

মনে কর মুক্তিবাহিনীরা মিলিটারীর সাথে যুদ্ধ করবে। সে জন্যে তাদের সাহায্য দরকার। তুই সাহায্য করবি?

মুহূর্তে ফজলুর চোখ গোল আলুর মত হয়ে গেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, সত্যি? সত্যি? খো— খোদার কসম?

হ্যাঁ। করবি?

ফজলু নাক দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, একশবার করব। কি বলিস তুই? করব না মানে? কি করতে হবে? কি?

আস্তে। আস্তে। সব বলব। কিন্তু জানিস তো এটা কাউকে বলতে পারিব না? কাউকে না। মরে গেলেও না। যখন আমি বলি মরে গেলেও না তার মানে আসলেই মরে গেলেও না। রাজাকারদের হাতে ধরা পড়তে পারিস। মিলিটারীর হাতে ধরা পরতে পারিস। তারা বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোকে মেরে ফেলতে পারে, নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলী করে মেরে ফেলতে পারে— কিন্তু তবু বলতে পারবি না।

খোদার কসম। বলব না। আল্লাহ্‌র কসম।

রাশেদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বলেছিলাম না সবাই সাহায্য করবে।

ফজলু বলল, এখন বল কি করতে হবে। বলছি। আগে দেখি আশরাফকেও পাওয়া যায় কি না।

আশরাফকে বলা মাত্র সেও রাজি হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো রাজি হবে না। সে ক্লাসে ফার্স্ট বয়, কখনো সে উল্টাপাল্টা জিনিস করে না। আগে রাশেদ যখন মিছিলে যেতো আশরাফ মাথা নেড়ে বলত, এত ছোট ছেলের মিছিলে যাওয়া ঠিক না। কিন্তু এটা তো আর মিছিল বা রাজনীতি না। এটা হচ্ছে দেশ আর দেশের স্বাধীনতা। মিলিটারী আর মুক্তিবাহিনী। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া।

১৩.

আমরা চারজন যখন হেঁটে হেঁটে রাশেদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাশেদ তার পরিকল্পনাটা আশরাফ আর ফজলুকে খুলে বলল। আশরাফ বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, তুমি কি পরীক্ষা করে দেখেছ? হাঁটা যায় গুলীর বেল্ট শরীরে বেঁধে।

আশরাফ আমাদের ফার্স্ট বয় এবং সে কখনো কাউকে তুই তুই করে বলে না।

দেখি নাই, কিন্তু হাঁটা যাবে না কেন?

যদি দেখা যায়? যদি বের হয়ে যায়?

আগে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

হ্যাঁ, আশরাফ চিন্তিত মুখে বলল, চিকন দড়ি না হয় সুতলি দিয়ে ভাল করে

শরীরের সাথে বেঁধে দিতে হবে।

হ্যাঁ।

আছে সুতলি তোমার বাসায়?

রাশেদ মাথা চুলকে বলল, খুঁজলে মনে হয় পাওয়া যাবে।

আশরাফ মাথা নেড়ে বলল, পাওয়া না গেলে? যাবার সময় কিনে নেব। আমার কাছে পয়সা আছে।

আশরাফ আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সে কখনো কাউকে তুই করে বলে না এবং সব সময় তার কাছে পয়সা থাকে।

ফজলু বলল, আমার যখন যাব তখন হাতে একটা বল নিয়ে গেলে কেমন হয়? যেন মনে হয় বল খেলতে যাচ্ছি?

আশরাফ উজ্জ্বল চোখে বলল, গুড আইডিয়া! বল আছে তোমার বাসায়?

না।

আমার বাসায় আছে, তোমরা দাঁড়াও আমি এক দৌড়ে বল নিয়ে আসি।

রাশেদে বাসা অনেক দূরে আমাদের পৌঁছাতে অনেকক্ষণ লাগল। বাসার দরজায় একটা তালা মারা। রাশেদ তার কোমরে বাঁধা একটা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাসায় কেউ নেই?

কে থাকবে আবার?

বাসায় কে থাকবে সেটা আবার কেমন ধরনের প্রশ্ন? বাবা থাকবে, মা থাকবে ভাই বোন থাকবে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই রাশেদ বিছানার নিচে থেকে চট দিয়ে ঢাকা একটা বাক্স টেনে আনল। বাক্সটার ভিতরে প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে রাখা গুলীর বেল্ট। আমি আগে কখনো গুলী দেখিনি। সাবধানে একবার হাত দিয়ে দেখলাম। মসৃণ চকচকে গুলী। কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা ভাব, হাত দিতেই শরীরটা কেমন জানি শির শির করে উঠল। কে জানে হয়তো এই গুলীটাই কোন পাকিস্তানী মিলিটারীর মগজের ভিতর দিয়ে যাবে!

ফজলু জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেয়েছিস গুলীর বাক্স?

জানতে চাইলে বলতে পারি। কিন্তু না বলাই ভাল, তাহলে কোনদিন ধরা পড়লেও তোকে যত অত্যাচার করা হোক তুই বলতে পারবি না।

অত্যাচারের কথা শুনে ফজলুর মুখটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু সে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, তা ঠিক!

রাশেদ একটা গুলীর বেল্ট বের করে আনে। আমরা ফজলুর উপর প্রথম চেষ্টা করলাম। শার্ট গেঞ্জি খুলে শরীরে প্যাচিয়ে প্যাচিয়ে গুলীর বেল্টটা সুতলি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেয়া হল। তার উপরে গেঞ্জি আর শার্ট পরে ফজলু জিজ্ঞেস করল, কি? দেখে বোঝা যাচ্ছে?

না। আশরাফ মাথা নেড়ে বলল, বোঝা যাচ্ছে না।

আমি বললাম, দেখে একটু মোটা লাগছে। কিন্তু তুই এত শুকনা যে একটু মোটা দেখতে ভালই লাগছে!

রাশেদ বলল, হাঁট দেখি একটু।

ফজলু ইতস্তত: কয়েক পা হাঁটল।

কি? অসুবিধা হচ্ছে হাঁটতে?

না। একটু ভারি কিন্তু হাঁটা যায়।

হাত পা একটু নাড়াচাড়া কর দেখি।

ফজলু তার হাত পা নাড়াচাড়া করল, একটু আড়ষ্টভাবে কিন্তু মোটামুটি ভালই বলতে হবে।

রাশেদ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি মনে হয়? কাজ করবে?

আশরাফ বলল, একশবার!

আমরা মোটামুটি উৎসাহ নিয়ে এবারে একজন একজন করে সবার শরীরে গুলীর বেল্ট প্যাচিয়ে নিলাম। উপরে কাপড় পরে নেয়ার পর দেখে আর বোঝার উপায় নেই। গুলীর বেল্টগুলি বেশ ভারি, আমরা তাই আর দেরি না করে রওনা দিয়ে দিলাম।

রাশেদ বলল, খুব সাবধান, আমাদের দেখে কেউ যেন সন্দেহ না করে।

হ্যাঁ, খুব সহজভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে যেতে হবে। আমি বললাম, যখন রাজাকারদের পাশে দিয়ে যাবি বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটবি না আবার বেশি দূর দিয়েও হাঁটবি না। পারলে একেবারে পাশে দিয়ে ঘেষে ঘেষে যাবি।

হ্যাঁ। আশরাফ মাথা নাড়ে।

রাজাকারদের সাথে কথাও বলা যায়। কয়টা বাজে বা সেরকম কিছু। যদি দেখি কাউকে দাঁড় করিয়ে চেক করছে তাহলে আমরাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি কেমন করে চেক করছে।

হ্যাঁ। অন্য সময় হলে তো তাই করতাম।

আশরাফ একটা দোকান থেকে চারটা কাঠি লজেন্স কিনল। কিছু খেতে খেতে হাঁটলে নাকি খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যায়। কাঠি লজেন্স চেটে চেটে খেতে খেতে আমরা আবিষ্কার করলাম কথাটা সত্যি।

আমাদের স্কুলের রাস্তার মোড়ে দুইটা রাজাকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দিয়ে যারা যাচ্ছে আসছে তাদের সবাইকে দেখছে। কেউ কোন ঝোলা বা বোঝা নিয়ে গেলে তাকে থামিয়ে সেই ঝোলা কিংবা বোঝা খুলে খুলে দেখছে। আমরা কথা বলতে বলতে তাদের খুব কাছে দিয়ে হেঁটে গেলাম। একজন রাজাকার চোখের কোণা দিয়ে আমাদের এক নজর দেখল, কিছু বলল না। রাজাকার দুজনকে পিছনে ফেলে এসে আমরা সবাই একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম। এখনো দুই নম্বর দলটা রয়ে গেছে।

দুই নম্বর দলটা আরেকটু সামনে, সেখানে রাজাকারদের সাথে কালো পোশাক

পরা দুইজন মিলিশিয়াও দাঁড়িয়ে আছে। মিলিশিয়াগুলির চেহারা কেমন যেন ভয়ংকর। উঁচু কপাল, উঁচু চিবুক, খাড়া নাক, কেমন যেন নিষ্ঠুর চেহারা।

আমরা যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ করে একটা রাজাকার জিজ্ঞেস করল, এই ছ্যামড়া, কই যাস?

আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম কিছু প্রশ্ন করলে সবাই একসাথে কথা না বলে শুধু একজন উত্তর দেবে। সেভাবেই আশরাফ বলটা মাটিতে একটা ড্রপ দিয়ে বলল, ফুটবল খেলতে।

রাজাকারটা অন্যজনকে বলল, শালার সখ দেখ! এই দুপুরের রোদে যায় ফুটবল খেলতে! তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, স্কুলের ভিতরে যাওয়া নিষেধ, জান তো?

রাশেদ বলল, জানি। আমরা স্কুলে যাচ্ছি না।

আমরা হেঁটে হেঁটে চলে এলাম, মিলিশিয়া দুইজন একটু অবজ্ঞা ভাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। যদি শুধু জানত আমরা কি নিয়ে যাচ্ছি আর আজ রাতে সেটা দিয়ে কি করা হবে!

স্কুলের সামনেই নূর মুহম্মদের বেকারী। রাশেদ চাপা গলায় বলল, আস্তে আস্তে ঢোক। কোন তাড়াহুড়া নাই।

ভিতরে নূর মুহম্মদ ক্যাশ রেজিস্ট্রারের সামনে বসে আছে। আমাদের দেখে চোখ না তুলে বলল, কি চাও?

বিস্কুট।

কি বিস্কুট?

চাঁদনী বাজারের কুকী।

মানুষ ছ্যাকা খেলে যেভাবে চমকে উঠে নূর মুহম্মদ সেভাবে চমকে উঠল। রাশেদ গলা নামিয়ে আমাদেরকে বলল, গোপন পাশওয়ার্ড!

নূর মুহম্মদ চোখ কপালে তুলে বলল, কি বললে? কি বললে?

চাঁদনী বাজারের কুকী।

চাঁদনী বাজারের?

হ্যাঁ। রাশেদ এবারে তার সার্ট তুলে গুলির বেল্ট দেখাল। সাথে সাথে একেবারে ম্যাজিকের মত কাজ হল। নূর মুহম্মদ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হায় আল্লাহ! ভিতরে আস। ভিতরে —

আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে রুটি তৈরির বড় চুলা থেকে গরম বাতাস বের হচ্ছে। রুটির মিষ্টি গন্ধ, আমার হঠাৎ খিদে পেয়ে গেল।

নূর মুহম্মদ তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ঘন ঘন ঢোক গিলতে গিলতে বলল, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

রাশেদ গম্ভীর গলায় বলল, বলার পারমিশান নাই।

ও, ও। তাতো বটেই।

তাড়াতাড়ি খুলেন বেল্টগুলি। আমাদের সময় নেই।

হ্যাঁ হ্যাঁ খুলছি। নূর মুহম্মদ ছুটে একটা চাকু এনে সুতলি কেটে গুলীর বেল্টগুলি খুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল। শফিক ভাই কি এখানে আছেন কোথাও? একবার মনে হল জিজ্ঞেস করি নূর মুহম্মদকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না। মুক্তিযোদ্ধাদের কৌতূহল দেখানোর কথা নয়।

আমরা বের হয়ে যাচ্ছিলাম, আশরাফ বলল, দাঁড়াও চারটা বিস্কুট কিনে নিই। কেউ যদি আমাদের লক্ষ্য করছে তাহলে কোন সন্দেহ করবে না।

আশরাফ পকেট থেকে পয়সা বের করছিল, নূর মুহম্মদ বলল, কোন পয়সা লাগবে না বাবা। কোনটা চাও?

ফজলু এগিয়ে গিয়ে দেখলো, নারকেল দেয়া বড় বড় বিস্কুট। নূর মুহম্মদ বয়ামে হাত ঢুকিয়ে বিস্কুট বের করে আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়।

আমরা বিস্কুট খেতে খেতে বেকারী থেকে বের হয়ে এলাম। কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না, কিন্তু আমরা কোন ঝুঁকি নিলাম না, সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম। অন্য পাশে আবার রাজাকারের পাহারা আছে, কিন্তু এখন আর ভয় কি?

আমরা অন্য রাস্তা ঘুরে রাশেদের বাসায় ফিরে এসে আবার আমাদের শরীরে গুলীর বেল্ট লাগিয়ে রওনা দিলাম। রওনা দেবার আগে শরীর একটু কাদা মাটি লাগিয়ে নিলাম, দেখে যেন মনে হয় ফুটবল খেলা হয়েছে বেশ।

আমরা এবারে উল্টোদিক দিয়ে হেঁটে এলাম, ভাবখানা ফুটবল খেলতে গিয়েছিলাম এখন ফুটবল খেলে ফিরে আসছি। রাজাকারগুলি আমাদের মনে রেখেছে কি না কে জানে— রাখলে ক্ষতি নেই দেখে কোন সন্দেহ করবে না। প্রথমবার আমাদের যেরকম ভয় ভয় লাগছিল এবারে সেরকম ভয়ও লাগল না। আমি একটা রাজাকারকে জিজ্ঞেসও করলাম কয়টা বাজে। রাজাকারটা অবিশ্যি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। রাশেদ বলল, ঘড়িটা কারো কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আসলে ঘড়ি দেখে সময় বলতে পারে না। সেই জন্যে উত্তর দেয় নাই। রাশেদ মনে হয় ঠিকই বলেছে!

দুইবারে আমরা গুলির বাক্সের প্রায় পুরোটুকু নূর মুহম্মদ বেকারীতে পৌঁছে দিলাম। এবারে আমাদের কয়েক সেকেন্ডের জন্য শফিক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। মুক্তিযোদ্ধা বললেই চোখের সামনে যেরকম একটা ছবি ফুটে উঠে তাকে দেখতে মোটেও সেরকম লাগছিল না। একটা খাটো লুঙ্গি পরে আছেন, খালি পা, গলা থেকে লাল একটা গামছা ঝুলছে। আমাদের দেখে চোখ মটকে বললেন, তোমরা তো দেখি বাঘের বাচ্চা।

আমরা কথা না বলে একটু হাসলাম। তখন শফিক ভাই এগিয়ে এসে একজন একজন করে আমাদের সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, যে দেশে এরকম বাঘের বাচ্চা থাকে সে দেশ যদি স্বাধীন না হয় তাহলে কোন দেশ স্বাধীন হবে?

আমরা যখন চলে আসছিলাম তখন চাপা গলায় বললেন, মনে থাকবে তো এটা টপ সিক্রেট?

আমরা বললাম, মনে থাকবে।

বাসায় ফিরে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পারলাম আজ আমাদের কপালে দুঃখ আছে। কারো বকুনী কারো পিটুনী খেতে হবে। আমরা নিজেদের শান্তনা দিলাম, একটু বকুনী পিটুনী খেলে কি হয়, কেউ কেউ তো দেশের জন্য গুলীও খাচ্ছে!

বাসায় যত বকুনী খাওয়ার কথা ছিল তত খেলাম না। দুপুরের রোদে কাদা মেখে ফুটবল খেলে এসেছি শুনে আব্বা কেমন যেন হাল ছেড়ে দেয়ার মত ভান করলেন। আমি যখন হাত পা ধুয়ে পরিস্কার হচ্ছি তখন শুনলাম আম্মা আর আব্বা খুব গম্ভীর গলায় কথা বলছেন। আম্মা বললেন, এত দিনের সংসার।

আব্বা বললেন, আগে মানুষ। তারপরে সংসার। যদি বেঁচে থাকি আবার সব হবে।

আম্মা বললেন, তা ঠিক।

এভাবে আর থাকা যায় না। শিকদার সাহেবকে সেদিন কি করল ভাবা যায় না। কোন দিন আমাকে করবে। আব্বা আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করবে আব্বা?

কিছু না।

আম্মা বললেন, সেটাই তাহলে ভাল। বাসা এভাবেই থাক। একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে চলে যাওয়াই ভাল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি সুযোগ?

আব্বা বললেন, গ্রামের বাড়িতে যাবার সুযোগ। ফরহাদ সাহেবরা যাচ্ছেন, তাদের সাথে যাব। তাদের গ্রামের বাড়িতে কয়দিন থেকে তারপর রওনা দেব। আজকাল আবার নাকি বাস যাচ্ছে।

ফরহাদ সাহেব মানে অরু আপার আব্বা?

হ্যা। কাউকে বলিস না যেন বাবা।

বলব না।

আমাকে না বললেও আমি কাউকে বলতাম না। এখন কখনো কাউকে কিছু বলতে হয় না। সব কিছু গোপন রাখতে হয়। আজ রাতে যে ভয়ংকর যুদ্ধ হবে সেটা যেরকম আমি গোপন রেখেছি!

১৪.

রাত্রে খেয়ে দেয়ে অন্যদিনের মত শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি জানি এই দিনটা অন্যদিনের মত না। মুক্তিবাহিনীরা আজ ক্যাম্পটা আক্রমণ করবে, চারিদিক থেকে

তারা এখন এগিয়ে আসছে। অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে উঠবে, পৃথিবীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তাদের হাতের মেশিনগান গর্জে উঠবে। বুলেট ছুটবে গ্রেনেট ফাটবে মর্টার মেশিন গান মানুষের চিৎকার —

আমার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়, কিছুতেই আর ঘুমাতে পারি না। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ–ওপাশ করতে থাকি।

ভেবেছিলাম সারারাতই বুঝি জেগে কাটিয়ে দেব, কিন্তু একসময় চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যুদ্ধের স্বপ্ন দেখতে থাকি আর একটু পর পর চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে থাকি। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে একটু পর আবার চমকে জেগে উঠি। একবার স্বপ্নে দেখলাম শফিক ভাই মেশিনগান দিয়ে গুলী করছেন আর কাদের তার মাঝে ছুটে যাচ্ছে। আমি বললাম কাদের যাস নে, কাদের মাথা ঘুরিয়ে বলল, কে? কে কথা বলে?

আমি বললাম আমি।

আমি কে?

আমি ইবু।

ইবু! তুই কোথায় ইবু?

এই তো।

কাদের আমাকে দেখতে পায় না, এদিক সেদিক তাকিয়ে ডাকল, ইবু ইবু ইবু —

আর ঠিক তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল আর আমি শুনলাম বিছানার কাছে জানালার নিচে দাঁড়িয়ে কে যেন নিচু গলায় ডাকছে, ইবু, এই ইবু।

আমি ভয় পাওয়া গলায় বললাম, কে?

আমি। রাশেদ।

রাশেদ! কি হয়েছে?

রাশেদ ফিসফিস করে বলল, বাইরে আসবি একটু? কথা আছে।

কোন শব্দ না করে দরজা খুলে বাইরে যাবার কোন উপায় নেই, আব্বা আম্মা কেউ একজন জেগে উঠবেন। জানালার শিক দুটিজোরে বাঁকা করে বের হয়ে যাওয়া যায়, আমি সেভাবে বের হয়ে নিচে নেমে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে রাশেদ?

একটা ঝামেলা হয়ে গেছে।

কি ঝামেলা?

শফিক ভাইয়ের সাথে আরেকজনের যাবার কথা ছিল।

কার?

আরেকজন মুক্তিযোদ্ধার। সে যেতে পারে নি।

কেন?

জানি না, কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। মনে হয় রাস্তায় পাহারা খুব বেশি। তাই

আমি ঠিক করেছিলাম আমি যাব।

তুই? তুই? তুই গিয়ে কি করবি?

শফিক ভাইকে সাহায্য করব। সবসময় একজনকে গুলীর বেল্ট ধরতে হয় জানিস না? আমি জানতাম না, তাই চুপ করে রইলাম।

আমি রওনা দিয়েছিলাম কিন্তু লাশকাটা ঘরের কাছে গিয়ে মনে হল ভিতরে কি যেন নাড়াচাড়া করছে।

শুনে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল। সত্যি?

ধুর সত্যি হবে কেমন করে। ভূত বলে কিছু নাই।

তাহলে?

তবু ভয় করে। তুই যাবি আমার সাথে?

আমি?

গভীর রাতে জানালা গলে বাসা থেকে বের হয়ে ভয়ংকর একটা যুদ্ধে গিয়ে জড়িয়ে পড়া বাচ্চা ছেলেদের কাজ নয়। অন্য কোন সময় হলে আমি কখনোই এটা করতাম না। কিন্তু এখন অন্য ব্যাপার। আমি বললাম, চল যাই।

রাশেদ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলল। আমি বললাম, হাসলি কেন?

আমি ভেবেছিলাম তুই রাজি হবি না, তখন আমাকেও যেতে হবে না! এখন আর কোন উপায় নাই, যেতেই হবে।

তুই-তুই— আসলে যেতে চাচ্ছিলি না?

যেতে চাই, আবার চাই না। ভয় করে। কিন্তু শফিক ভাইয়ের সাথে কারো থাকা দরকার। অপারেশান পুরোটা নির্ভর করছে শফিক ভাইয়ের উপর। শফিক ভাইয়ের যদি কিছু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

চল তাহলে যাই।

চল।

গভীর রাতে অন্ধকারে নিজেদের আড়াল করে আমরা রওনা দিলাম। রাশেদ দাবী করে সে পিছন দিয়ে এবং নানারকম গলি দিয়ে নূর মুহম্মদের বেকারীতে পৌঁছে যাবে। অন্য কেউ হলে আমি কখনো তার কথা বিশ্বাস করতাম না কিন্তু রাশেদের কথা ভিন্ন। রাশেদ কখনোই বাজে কথা বলে না। আজগুবি এবং অবিশ্বাস্য কথা বলে কিন্তু বাজে কথা বলে না।

শফিক ভাই আমাদের দুজনকে দেখে খুব অবাক হলেন, চারিদিকে অন্ধকার তাই তার মুখটা দেখতে পেলাম না কিন্তু কথা শুনে মনে হল শুধু অবাক হলেন না কেমন যেন একটু রেগে গেলেন। বললেন, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে এখানে এসেছ? এটা কি বাচ্চাদের খেলা?

রাশেদ বলল, আপনি যদি না চান তাহলে এক্ষুনি চলে যাব। আমরা ভেবেছি একা

আপনার অসুবিধা হবে।

তাই বলে তোমরা?

আমরা কি কিছু করতে পারি না? ম্যাপ তৈরি করে দিই নাই? গুলী এনে দিই নাই?

এখন যদি তোমাদের কিছু হয়?

আপনার যদি কিছু হয়?

আমি যুদ্ধ করতে এসেছি —

আমি বললাম, আমরাও যুদ্ধ করতে এসেছি। এটা আপনার যেরকম দেশ— আমাদেরও সেরকম দেশ। বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

রাশেদ বলল, আপনি সত্যি সত্যি বলেন আমরা থাকলে আপনার কোন অসুবিধে হবে কি না, আমরা তাহলে এক্ষুনি চলে যাব। এক্ষুনি।

শফিক ভাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আছে থাক। এদিকে আস তোমাদের কয়টা জিনিস দেখিয়ে দিই। যদি আমার কিছু হয় তোমরা ট্রিগারটা টেনে ধরে রাখবে যতক্ষণ গুলীর বেল্টটা শেষ না হয়। তারপর এখান থেকে পালাবে। বুঝেছ?

বুঝেছি।

এখানে আস, বেসিক কয়টা জিনিস শিখিয়ে দিই।

শফিক ভাই গভীর রাতে নূর মুহম্মদের বেকারীর ছাদে আমাদের লাইট মেশিনগান কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দিতে লাগলেন। সারাক্ষণ আমরা ফিসফিস করে নিচু গলায় কথা বলছি, কিন্তু তবু বুঝতে পারি হঠাৎ করে শফিক ভাই আমাদের সাথে আর বাচ্চা ছেলেদের মত কথা বলছেন না। এমনভাবে আমাদের সাথে কথা বলছেন যেন আমরা তার সমান। যেন আমরাও বড় মানুষ।

সেই অন্ধকার রাতে আমি আর রাশেদ হঠাৎ করে বড় হয়ে গেলাম।

আমরা তিনজন চুপচাপ বসে আছি। একটু আগে আকাশে মেঘ ছিল। হঠাৎ করে মেঘ কেটে যাচ্ছে, এখানে সেখানে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছে। আমরা চুপচাপ বসে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আছি। শফিক ভাই হঠাৎ বললেন, যখন গোলাগুলী শুরু হবে তখন তোমরা মাটিতে শুয়ে পড়বে।

ঠিক আছে।

মিলিটারী যখন বুঝতে পারবে আমি এখান থেকে কভার দিচ্ছি তখন এদিকে গুলী করবে। চেষ্টা করবে আমাকে থামিয়ে দিতে। আমাদের অপারেশনটা শেষ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। বেশি সময় দেয়া যাবে না।

কি হবে বেশি সময় দিলে?

ভারি অস্ত্র বের করে আনবে। আর, আর, না হয় অন্য কিছু।

আর. আর. মানে কি?

রিকয়েললেস রাইফেল। খুব শক্ত জিনিস। দালান কোঠা ট্যাঙ্ক পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়।

কতক্ষণ হবে যুদ্ধ?

বেশিক্ষণ না। খুব তাড়াতাড়ি অপারেশান শেষ করতে হবে। সেটাই ভরসা। অস্ত্রগারটা উড়িয়ে দিলেই কাজ কমপ্লিট।

তারপর কি হবে?

তখন আমরা সরে পড়ব। ওই পাশ থেকে আমাদের কভার দেবে।

শফিক ভাই খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, ভয় লাগছে তোমাদের?

হ্যাঁ। আমার একটু বমি বমি লাগছে।

শফিক ভাই নিচু স্বরে হেসে বললেন, রাত জেগে অভ্যাস নেই তো তাই বমি বমি লাগছে। আর ভয় লাগলে ঘাবড়ে যেও না। এটা ভয়েরই ব্যাপার। ভয় লাগটা স্বভাবিক। শুধু চেষ্টা করবে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা চুপ করে রইলাম। শফিক ভাই বললেন, আমি খালি ভাবছি যখন তোমাদের আম্মা আব্বা খবর পাবেন তোমরা এখানে তখন তাদের কি অবস্থা হবে?

আমি দুর্বলভাবে বললাম, কি আবার হবে!

আমরা আবার চুপ করে বসে থাকি। সামনে মিলিটারী ক্যাম্পে কোন শব্দ নেই। মনে হয় সবাই ঘুমাচ্ছে, জানেও না একটু পরে তাদের উপর কি বিপদ নেমে আসবে। কি ভয়ানক একটা যুদ্ধ হবে!

আমি ফিসফিস করে বললাম, শফিক ভাই—

কি হল?

আপনার কি ভয় লাগছে?

শফিক ভাই নিচু স্বরে হেসে বললেন, হ্যাঁ ইবু লাগছে। যেখানে ভয় পাওয়ার কথা সেখানে সবাই ভয় পায়। শুধু যারা ক্ষ্যাপা তারা কখনো ভয় পায় না। ভয় পেতে কোন দোষ নেই কিন্তু ভয় পেয়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যেতে হবে। সেটাই হচ্ছে যাকে বলে বীরত্ব। দেখবে যখন যুদ্ধ শুরু হবে হঠাৎ করে ভয়ের কথা মনে থাকবে না। তখন শুধু কাজ করে যাওয়া। গুলী করে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কভার দেওয়া—

ঠিক এই সময় রাতের অন্ধকার আর নৈঃশব্দকে চৌচির করে খুব কাছে থেকে ট্যাট ট্যাট করে মেশিন গানের গুলীর শব্দ হল। আমি আর রাশেদ ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে শুয়ে পড়লাম, শফিক ভাই একটুও নড়লেন না। আস্তে আস্তে বললেন, জামাল। এইটা জামাল।

আবার গুলীর শব্দ হল, প্রথমে ছাড়া ছাড়া তারপর একটানা। বড় বড় কয়টা বিস্ফোরণ হল, শফিক ভাই মাথা বের করে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, ভালই তো ছুড়েছে গ্রেনেডটা। এটা রফিক ছাড়া কেউ না। ক্রিকেট খেলার বল করে করে

হাতের মাসল কি শক্ত করেছে দেখেছ? এত জোরে ছুড়ে যে দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

ক্যাম্পের মাঝে হৈ-চৈ শুরু হয়েছে, চিৎকার করে কথা বলছে। লোকজন ছুটাছুটি করছে। আমি বললাম, শফিক ভাই, গুলী করেন। গুলী করেন —

যত দেরি করে করা যায়। পজিশানটা জানতে দিতে চাই না। ছাদে বাংকার ওঠার চেষ্টা করলে করব।

বাংকারে কেউ নাই তো?

না। তোমাদের কথা ঠিক।

আমি আর রাশেদ মাথা নিচু করে শুয়ে রইলাম।

রাশেদ সাহস করে একবার মাথা উঁচু করে দেখে আবার মাথা নিচু করে ফেলল।

প্রচণ্ড গুলীর শব্দে কানে তালা লেগে গেল। তার মাঝে আমি মানুষের গলার শব্দ পেলাম, মনে হল কে যেন চিৎকার করে বলল, জয় বাংলা! ইশ, কতদিন পর স্বাধীন বাংলার এই শ্লোগানটা শুনলাম। এত গোলাগুলী হৈ-চৈ তার মাঝেও আমি আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাই, ঢাকের মত শব্দ করছে। মাটিতে মাথা লাগিয়ে আমি মনে মনে বললাম, হেই খোদা, তুমি আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখ। সবাইকে বাঁচিয়ে রাখ বাঁচিয়ে রাখ . . .

শফিক ভাই বললেন, এক শালা বাংকারে ওঠার চেষ্টা করছে। দেই একটা এখন, দেই—

কানের কাছ থেকে হঠাৎ করে তার মেশিন গান গর্জে উঠল।

রাশেদ মাথা উচু করে বলল, মরেছে? মরেছে?

জানি না। গড়িয়ে পড়ে গেল। কভার নেয়ার জন্যে না গুলী খেয়ে বোঝা গেল না। তোমরা উঠবে না, খবরদার, এখন আমাদের গুলী করবে।

শফিক ভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই আমাদের মাথার উপর দিয়ে শীষ দেয়ার মত শব্দ করে কি জানি ছুটে গেল আর প্রায় সাথে সাথেই গুলীর শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই আমাদের গুলী করছে। বুলেট শব্দ থেকে আগে যায় তাই শব্দটা শোনা যায় পরে। আমি মাটিতে মাথা লাগিয়ে শুয়ে থেকে বললাম, হে খোদা, হে পরম করুণাময় তুমি আমাদের যুদ্ধে জয়ী করে দাও। যুদ্ধে জয়ী করে দাও।

শফিক ভাই ছাড়াছাড়া ভাবে গুলী করতে লাগলেন। ফাকা কার্তুজের খুলি ছিটকে ছিটকে বের হতে লাগল, বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে এল। তার মাঝে আমি আর রাশেদ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি। রাশেদ চিৎকার করে বলল, কি অবস্থা শফিক ভাই?

ভাল। খুব ভাল। শুয়ে থাক, উঠবে না।

আমরা শুয়ে থেকে এক ভয়ংকর যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে রইলাম। যুদ্ধ। যার অর্থ একজন মানুষের অন্য একজন মানুষকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা। ঠাণ্ডামাথায় চিন্তা ভাবনা করে। যেই যুদ্ধ আমাদের করার কথা ছিল না। সেই যুদ্ধে একদিকে পাকিস্তান মিলিটারী। যারা সারা জীবন শুধু এটাই শিখছে কিভাবে মানুষ মারতে হয়। অন্য দিকে

শফিক ভাইয়ের মত ছেলেরা যাদের যুদ্ধ করার কথা না এখন স্কুল কলেজে পড়াশোনা করার কথা।

আমাদের মাথার উপর দিয়ে শীষ দেয়ার মত শব্দ করে বুলেট উড়ে যাচ্ছে, দেয়ালে গুলী লেগে কখনো আমাদের উপর চুন বালি খসে পড়ছে, আশে-পাশে চারিদিকে জিনিসপত্র ভেঙে পড়ছে। আমরা তার মাঝে মাথা নিচু করে শুয়ে থেকে বলি, হে খোদা পরম করুণাময় . . .

ঠিক এরকম সময় শফিক ভাই গুলী খেলেন। আমরা বুঝতে পারিনি, হঠাৎ দেখলাম শফিক ভাই যন্ত্রণার মত একটা শব্দ কেমন যেন গড়িয়ে পিছন দিকে পড়ে গেলেন। আমি ভয় পাওয়া গলায় ডাকলাম, শফিক ভাই, শফিক ভাই।

শফিক ভাই কোন কথা বললেন না।

রাশেদ গড়িয়ে গড়িয়ে শফিক ভাইয়ের কাছে যেতে থাকে। আমিও পিছু পিছু গেলাম। কাছে গিয়ে ডাকলাম, শফিক ভাই —

শফিক ভাই যন্ত্রণার মত শব্দ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যাও কাভার দাও।

কাভার?

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি।

আমরা বুঝতে পারলাম শফিক ভাই আমাদের গুলী করতে বলছেন। আমি বললাম, কিন্তু আপনি —

তাড়াতাড়ি।

আমি আর রাশেদ গুড়ি মেরে এস.এম.জি.টার দিকে এগিয়ে যাই। সেটাকে শক্ত করে চেপে রেখে ট্রিগার টেনে ধরলাম, সাথে সাথে ভয়ংকর কর্কশ শব্দ করে পুরো এস.এম.জি.টা জীবন্ত কোন প্রাণীর মত ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে গুলী বের হয়ে এল আগুনের হলকার মত।

আরেকটু নিচে, ডান দিকে। শফিক ভাইয়ের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, সিঁড়ির দিকে এইম কর।

আমরা সিঁড়ির দিকে নিশানা করে আবার ট্রিগার টেনে ধরলাম। সাথে সাথে ভয়ংকর শব্দ করে আবার গুলী বের হতে থাকে, থরথর করে কাঁপতে থাকে মেশিন গান। সিঁড়ি বেয়ে একজন উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল হঠাৎ সে লাফিয়ে সরে গেল।

থাম। এখন থাম।

আমরা থামলাম।

শফিক ভাই আবার একটা কাতর শব্দ করে বললেন, আবার। এখন আবার শুরু কর।

আমি আবার ট্রিগার টেনে ধরলাম। ভয়ংকর শব্দ করে আবার মেশিন গানটা থর থর করে কাঁপতে থাকে। গুলীর বৃষ্টি হতে থাকে তার ভেতর থেকে। প্রচণ্ড দম বন্ধ করা আতংকটা আর নেই। শুধু আতংক নয় দুঃখ কষ্ট ব্যথা কোন কিছু নেই। মাথার মাঝে

কেমন জানি ভোতা একটা ভাব। যেন কিছু হলেই আর কিছু আসে যায় না। যেন এর কোন শুরু ছিল না যেন এর কোন শেষ নেই। যেন এখানে এইভাবে ট্রিগার টেনে ধরে রাখাটাই হচ্ছে আমাদের জীবন। এর বাইরে কিছু ছিল না। কিছু থাকবে না।

থাম। এখন থাম।

আমরা থামলাম। আর ঠিক তখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারিদিক আলো হয়ে গেল। আমরা গরম বাতাসের একটা ঝাপটা অনুভব করলাম। মনে হল পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। একটা বিস্ফোরণ শেষ হতেই আরেকটা, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা।

শফিক ভাই ক্লান্ত স্বরে বললেন, জব ওয়েলডান।

আপনার কি হয়েছে?

গুলী লেগেছে।

কোথায়?

পায়ে। এস.এম.জি.-তে লেগে ছিটকে এসেছে। ব্লিডিং হচ্ছে। হাড় ভেঙেছে কি না বুঝতে পারছি না।

শফিক ভাই যন্ত্রণার মত শব্দ করে পাটা নড়ানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ওঠার চেষ্টা করে ধপ করে পড়ে গেলেন। কাতর শব্দ করে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে পায়ের উপর শক্ত করে বাঁধলেন। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বললেন, কি একটা ঝামেলা!

শফিক ভাই বাইরে তাকালেন। এখনো ছাড়াছাড়া ভাবে বিস্ফোরণ হচ্ছে। চারদিকে আগুন লেগে গেছে, তার মাঝে মানুষজন ছুটাছুটি করছে। চারদিকে চিৎকার হৈ-চৈ। শফিক বাইরে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ কি যেন দেখে চমকে উঠলেন। আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, তোমরা যাও। এক্ষুনি যাও।

যাব?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। তাড়াতাড়ি যাও।

কিন্তু আপনি।

শফিক ভাই ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, আমার কথা তোমাদের ভাবতে হবে না। তোমরা যাও এক্ষুনি। মিলিটারী আসছে পালাও —

কিন্তু আপনাকে ছেড়ে —

শফিক ভাই বললেন, আমার দায়িত্ব আমি নেব। তোমরা যাও এই মুহূর্তে। রাইট নাও।

কিন্তু —

শফিক ভাই এবারে চিৎকার করে বললেন, তোমরা যাও। দিস ইজ এন অর্ডার।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম । কিছু আর ভাবতে পারছি না। কেমন একটা ঘোরের মাঝে বের হয়ে এলাম। চারিদিকে আগুন জ্বলছে। আগুনের শিখায় সবকিছু কেমন যেন

অবাস্তব মনে হচ্ছে। মানুষজন চিৎকার করে ছুটাছুটি করছে। একজন মানুষ তার বাচ্চাকে বুকে চেপে ছুটে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে তার স্ত্রী। কি ভয়ংকর আতংক তার মুখে।

হঠাৎ আমরা থমকে দাঁড়ালাম। মিলিটারীর একটা দল ছুটে আসছে, সাথে কিছু রাজাকার। আমাদের পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সবগুলি। ওরা নূর মুহম্মদের বেকারীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিছু একটা কি টের পেয়েছে ওরা?

১৫.

আমি যখন বাসায় ফিরে এলাম তখন আকাশটা একটু একটু ফর্সা হয়ে উঠেছে। আমাদের বাসার বারান্দায় অনেক মানুষ, সবাই পূর্বদিকে তাকিয়ে আগুন দেখছে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে দেখে সবাই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করবে আমি কোথায় ছিলাম। কিন্তু আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। দেখলাম আরো কিছু ছোট বাচ্চা উঠে এসে দৌড়াদৌড়ি ছুটোছুটি করছে। বড়রা উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলছে, সবার মাঝে কেমন জানি এক রকমের আনন্দের ভাব। আমাকে দেখে আম্মা বললেন, যাও ইবু এখন গিয়ে শুয়ে পড়। যুদ্ধ শেষ।

আমি তখন বুঝতে পারলাম আব্বা আম্মা টের পাননি আমি বাসায় ছিলাম না এবং এই মাত্র ফিরে এসেছি। ভেবেছেন আমি বাসাতেই ছিলাম যখন গোলাগুলীর শব্দে সবাই বের হয়ে এসেছে তখন আমিও বের হয়েছি। যদি সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হত তাহলে এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারত না। কিন্তু সব কিছু ভালয় ভালয় শেষ হয়নি। শফিক ভাই গুলী খেয়ে নূর মুহম্মদের বেকারীর ছাদে পড়ে আছেন, জানি না তিনি সরে পড়তে পেরেছেন কি না, কিংবা লুকিয়ে পড়তে পেরেছেন কিনা। এত বড় একটা খবর আমি নিজের ভিতর কেমন করে চেপে রাখি? আমার ইচ্ছে হচ্ছিল কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করুক আর আমি তাকে বলি। কিন্তু কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল না। আমি শুনলাম আব্বা অরু আপার আব্বাকে বলছেন, তার মানে মুক্তিযুদ্ধ এখন আর র‍্যানডম ঘটনা না। মনে হচ্ছে ভালভাবে অর্গানাইজড হয়েছে।

অরু আপার আব্বা বললেন, তাই তো মনে হচ্ছে। এত বড় একটা মিলিটারী ক্যাম্প আক্রমণ করে তার একটা পার্ট উড়িয়ে দেয়া সোজা কথা?

আম্মা বললেন, আহা, কোন মুক্তিযোদ্ধার গায়ে গুলী লেগেছে কি না কে জানে। খোদা বাঁচিয়ে রাখ তুমি ছেলেদের।

অরু আপাও আছেন সবার মাঝে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দেখলি ইবু কেমন যুদ্ধ করল, মুক্তিবাহিনী!

আমি চুপ করে রইলাম। অরু আপা বললেন, একেবারে যাকে বলে ফাটাফাটি!

আমি তবু চুপ করে রইলাম। অরু আপা একটু অবাক হয়ে বললেন, কি হল কথা

বলছিস না কেন?

আমার চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল। অরু আপা নিচু হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, তোর মুখে কালি কেন?

আমি জানতাম না, নিশ্চয়ই মেশিনগানের বারুদ। হাত দিয়ে মোছার চেষ্টা করলাম, অরু আপা তার ওড়না দিয়ে মুছতে মুছতে হঠাৎ লক্ষ্য করলেন আমার চোখে পানি। অবাক হয়ে বললেন, কি হল ইবু? কাঁদছিস কেন?

আমি চোখের পানি আটকানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

অরু আপা হঠাৎ একটা সন্দেহ করলেন। খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর গলা নিচু করে জিজ্ঞেস করলেন, তুই আবার বাসা থেকে পালিয়েছিলি?

আমি কোন কথা বললাম না।

তুই যুদ্ধটা দেখে এসেছিস কাছে থেকে?

আমি মাথা নিচু করলাম, হঠাৎ অরু আপা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, যুদ্ধে কি কারো কিছু হয়েছে?

আমি চুপ করে রইলাম।

অরু আপা চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন, শফিক? শফিকের কিছু হয়েছে?

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। আমার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি বের হয়ে এল।

অরু আপা এক পা পিছনে সরে এসে দেয়ালটা ধরে নিজেকে সামলে নিলেন।

বারান্দায় তখনো সবাই দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। লাল আগুন মনে হয় আকাশকে ছুঁয়ে ফেলবে। মুক্তিবাহিনীর আগুন। কেউ জানতে পারল না অরু আপার পৃথিবী কেমন করে ধ্বসে পড়ছে সেই আগুনের সাথে সাথে।

বেলা দশটার দিকে মাইক দিয়ে একজন মানুষ ঘোষণা করতে করতে গেল যে শহরের অবস্থা শান্ত, ভয়ের কারণ নেই। যে সব দুষ্কৃতকারী এসেছিল বীর পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়। একজনকে জ্যান্ত ধরা হয়েছে। গুলীবিদ্ধ সেই দুস্কৃতকারীকে কিছুক্ষণের মাঝে ঈদগাহ মাঠে নিয়ে আসা হবে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামিক দেশকে খণ্ডবিখণ্ড করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধের জন্যে ভারতের অনুচর এই দুস্কৃতকারীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। সেই শাস্তিদৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্যে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আজরফ আলী সবাইকে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

মাইকের ঘোষণাটি শুনে আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। ভারতের অনুচর আর দুস্কৃতকারী বলতে এরা বোঝাচ্ছে শফিক ভাইকে। শফিক ভাই নূর মুহম্মদের বেকারী

থেকে পালাতে পারেন নি, মিলিটারীরা তাঁকে ধরে ফেলেছে। এখন শান্তি কমিটির লোকেরা মিলে তাকে সবার সামনে খুন করবে? খুন করবে? শফিক ভাইকে খুন করবে?

আমার হঠাৎ সারা শরীর গুলিয়ে উঠল, কিছু বোঝার আগে আমি হড়হড় করে বমি করে ফেললাম। আম্মা ছুটে আমাকে ধরলেন, কি হয়েছে বাবা? হঠাৎ কি হয়েছে?

আমি আম্মার দিকে তাকিয়ে বললাম, আম্মা, শান্তি কমিটির লোকেরা শফিক ভাইকে মেরে ফেলবে!

কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ আম্মা। শফিক ভাই কাল রাতের যুদ্ধে গুলী খেয়েছেন।

তুই তুই কেমন করে জানিস?

আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম, আম্মা আমাকে বুকে জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, হায় খোদা, এ তুমি কি করলে খোদা?

রাশেদ এল এগারটার দিকে। সে ঈদগাহের মাঠ হয়ে এসেছে। সেখানে একটা গাছ থেকে লম্বা একটা ফাঁসির দড়ি ঝোলানো হয়েছে। রাজাকাররা জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। আজরফ আলী এসে গেছে, শফিক ভাইকে আনলেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা শফিক ভাইকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে না।

জানি না। নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু কেমন করে করবে?

তাহলে?

যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা হয়তো ধরে রেখেছে অনেকে এভাবে মারা যাবে। রাশেদ বিষণ্ণ মুখে বলল, আমি জানি না।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম। রাশেদ আস্তে আস্তে বলল, আমি কি করেছি জানিস?

কি?

যারা ওখানে মজা দেখতে এসেছে তাদেরকে বলেছি যে শোনা যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা সুইসাইড স্কোয়াড ঈদগাহে আসছে। ভয়ংকর গোলাগুলী হবে। নিজেরাও মরবে যারা আছে তাদেরকেও শেষ করে দেবে।

বানিয়ে বলেছিস?

না। পুরোটা বানিয়ে বলি নাই।

তাহলে?

রাশেদ হাত নেড়ে বলল, আমাকে জিজ্ঞেস করিস না। কিন্তু জানিস, যখন খবরটা শান্তি বাহিনীর কাছে গেছে তখন হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেছে, লোকজন সরে যাচ্ছে।

তাহলে কি শফিক ভাইকে এখন মারবে না?

জানি না।

ঠিক তখন আবার মাইকে ঘোষণা দিতে দিতে একটা রিক্সা আসতে থাকে। ঘোষণায় বলা হয় বিশেষ কারণে দুস্কৃতিকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা এখন যেন ঈদগাহে না যায়। নতুন করে সময় ঘোষণা করা হবে।

রাশেদ আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বলল, আমার খবরটা কাজে দিয়েছে মনে হয়, শফিক ভাই এখন জানে বেঁচে গেলেন।

কিন্তু কতক্ষণ?

জানি না।

সারাদিন আমাদের শহরটাতে হেলিকপ্টার আসতে লাগল। মিলিটারী নিশ্চয়ই অনেক মারা পড়েছে, অনেক আহত হয়েছে। যারা বেশি আহত তাদেরকে হেলিকপ্টারে সরিয়ে নিচ্ছে। রেল স্টেশনে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। স্পেশাল ট্রেন এসেছে একটা, অনেক মিলিটারী নেমেছে সেই ট্রেন থেকে। ট্রেচারে করে অনেক মৃতদেহ তোলা হচ্ছে ট্রেনে। অস্ত্রগারটা যখন উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের স্কুলের একটা অংশও নাকি উড়ে গেছে। স্কুলের লাইব্রেরী ছিল সেটা, কত মজার বই ছিল সেখানে।

দুদিন পরে আমরা খবর পেলাম শফিক ভাই এখনো বেঁচে আছেন। শুধু যে বেঁচে আছেন তাই নয় তাকে সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শান্তি কমিটি আর রাজাকাররা তাকে এখনই মেরে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু পাকিস্তানী মিলিটারীরা তাকে আরো কয়দিন বাঁচিয়ে রেখে তার কাছ থেকে কিছু খবর বের করতে চায়। খবর বের করার জন্যে তার উপর অত্যাচার করা হবে আর মানুষকে অত্যাচার করতে হলে আগে নাকি তাকে সুস্থ করে নিতে হয়। মানুষকে অত্যাচার করার জন্যে সবচেয়ে ভয়ংকর নিয়মগুলি নাকি পাকিস্তানী মিলিটারী থেকে ভাল করে কেউ জানে না। পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে মাথা ডুবিয়ে রাখে, নখের নিচে গরম সূচ ঢুকিয়ে দেয়, নখ টেনে তুলে ফেলে, ঝুলিয়ে রেখে চাবুক দিয়ে মারতে থাকে আরো কত কি।

আমি আর রাশেদ কয়েকদিন সরকারী হাসপাতালের আশে-পাশে দিয়ে ঘুরে এসেছি। একদিন ভিতরেও গিয়েছি, এক কোণায় একটা ঘরের বাইরে দুইজন পুলিশ আর রাজাকার বসে আছে। ভিতরে কে আছে জিজ্ঞেস করেছিলাম সাহস করে, তখন আমাদের ধমক দিয়ে বের করে দিয়েছে। অবিশ্যি কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেই আমরা বের করে ফেলেছি ভিতরে শফিক ভাই আছেন। মনে হয় আগের থেকে ভাল আছেন, খুড়িয়ে খুড়িয়ে নাকি একটু হাঁটতে পারেন। ভাল ভাল ওষুধ দেয়া হচ্ছে তাকে তাড়াতাড়ি ভাল করে নেয়ার জন্যে। দু'একদিনের মাঝেই তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে অত্যাচার করে খবর বের করার জন্যে। তারপর তাকে মেরে ফেলা হবে। অত্যাচার করার সময়েই নাকি সাধারণত মারা যায় আলাদা করে আর মারতে হয় না।

সব কিছু জেনেশুনে আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে থাকে। সেদিনও আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে আছে। একজনের মন খারাপ হলে অন্যদেরও মন খারাপ হয়ে যায়। তাই যখন আশরাফ বলল শফিক ভাই যদি যুদ্ধে মারা যেতেন সেটাই তাহলে বেশি ভাল হত তখন আমাদের আরো বেশি মন খারাপ হয়ে গেল। ফজলুও তখন আরো বেশি মন খারাপ করা একটা কথা বলতে যাচ্ছিল রাশেদ তখন তাকে থামিয়ে বলল, শফিক ভাইকে উদ্ধার করে আনলে কেমন হয়?

আমরা বাকি তিনজন একবারে চমকে উঠলাম, বললাম, কি বললি?

শফিক ভাইকে উদ্ধার করে আনলে কেমন হয়?

উদ্ধার? উ-উ-উ— ফজলু কথা শেষ করতে পারে না।

হ্যাঁ। রাশেদ গলা নামিয়ে বলল, আজ কাল যে কোনদিন শফিক ভাইকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। একবার ক্যাম্পে নিয়ে গেলে শেষ। উদ্ধার করার এখনই হচ্ছে সময়—

কিন্তু কিন্তু— আশরাফ তোতলাতে থাকে।

কিন্তু কি?

এত কি সোজা? পুলিশ রাজাকার পাহারা থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। শফিক ভাই হাঁটতে পারেন না, তাকে উদ্ধার করে আনবি মানে? উদ্ধার করে এনে রাখবি কোথায়?

রাশেদ ভুরু কুচকে বলল, আমার একটা প্ল্যান আছে। প্ল্যানটা আগে শোন, তারপর ভেবে দেখ। ভয়ংকর বিপদের প্ল্যান কিন্তু কাজ করতে পারে। আমাদের চারজনকে নিয়ে প্ল্যান।

আমাদের চারজনকে নিয়ে?

হ্যাঁ। এই প্ল্যানটা কাজ করবে কি না সেটা নির্ভর করবে দুইটা জিনিসের ওপর। এক: সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার জয় বাংলার লোক কি না। দুই: একটা স্টেনগান।

স্টেনগান?

হ্যাঁ। দুই নম্বর জিনিসটা হয়ে গেছে।

মানে? আমি আবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি বললি?

আমার কাছে একটা স্টেনগান আছে। মুক্তিবাহিনী আমাকে ব্যবহার করতে দেয় নাই, লুকিয়ে রাখতে দিয়েছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় যদি দরকার পড়ে আমি ব্যবহার করব।

রাশেদ একটু থেমে বলল, এক নম্বর জিনিসটা নিয়ে সন্দেহ ছিল সেটাও এখন নাই। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার সিরাজুল করিম পুরোপুরি জয় বাংলার মানুষ। ডাক্তার সাহেব হাসপাতালের লুকিয়ে গুলী-খাওয়া মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা করেছেন। গতকাল পাকা খবর পেয়েছি।

কোথা থেকে খবর পেয়েছিস?

জিজ্ঞেস করিস না, তোদের জানার দরকার নাই।

আমাদের মনে পড়ল যেটা জানার দরকার নেই, সেটা নিয়ে আর কৌতূহল

দেখানো ঠিক না।

আশরাফ বলল, প্ল্যানটা আগে বল। শুনে দেখি।

খুব ডেঞ্জারাস। আমরা মারা পড়তে পারি । আবার—

আবার কি?

অবস্থা জটিল হয়ে গেলে আমাদের স্টেনগানের গুলীতে একটা দুইটা রাজাকার মরতেও পারে। আমি অবশ্য সেটা চাই না ।

আমরা মাথা নাড়লাম, আমরাও চাই না।

প্ল্যানটা আগে বল।

শোন তাহলে, স্টেনগান ছাড়া লাগবে একটা ছোট কাঁচি, কয়েকটা চিঠি আর একটা ব্যান্ডেজ।

আমি ভুরু কুচকে বললাম, চিঠি? ব্যান্ডেজ? কাঁচি? কি বলছিস?

শোন তাহলে— রাশেদ গলা নামিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা খুলে বলে আর শুনে আমরা একেবারে হা হয়ে যাই। রাশেদের মাথায় যে এত বুদ্ধি আমরা ঘূর্ণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি! বড় হলে সে আইনস্টাইন না হয় নাসিরুদ্দিন হোজ্জা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফজলু তার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, ফার্স্ট ক্লাস!

কি মনে হয় কাজ করবে?

আশরাফ বলল, একশবার!

তাহলে এখন সবাই প্রতিজ্ঞা কর এটা কাউকে বলবি না।

আমরা একসাথে বললাম, কাউকে বলব না।

শুধু তাই নয় চারজন একসাথে হাতে হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম শফিক ভাইকে আমরা বাঁচাব। যেভাবেই হোক।

১৬·

সরকারী ডাক্তার সিরাজুল করিমের বাসা হাসপাতালের সাথে লাগানো। তৈরি করা হয়েছে এভাবে, যেন হঠাৎ কোন প্রয়োজন হলে বাসা থেকে এক ছুটে হাসপাতালে চলে যেতে পারেন। তার বয়স বেশি না। একটু মোটা মতন, মাথার সামনে চুল পাতলা হয়ে আসছে। দুইটা ছোট ছোট বাচ্চা আছে। আমরা পরদিন সকালে তার সাথে দেখা করতে গেলাম, পরিকল্পনার এটা হচ্ছে প্রথম কাজ। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল চারজনই যাব কিন্তু রাশেদ বলল যে শুধুমাত্র একজন যাব। গোপনীয়তার জন্যে চারজন একসাথে যেতে পারবে না। আমরা তখন ঠিক করলাম আশরাফ যাবে। সে খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারে। আশরাফ রাজি হল না, গত বছর তার যখন চিকেন পক্স হয়েছিল ডাক্তার সিরাজুল করিম তাকে দেখেছিলেন, তাকে চিনে ফেলতে পারেন। তখন সবাই

বলল আমাকে যেতে। আমি মোটেও চাচ্ছিলাম না কিন্তু কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে। কাজেই আমি রাজি হলাম। কি বলতে হবে কিভাবে বলতে হবে কয়েকবার ঝালাই করে নিয়ে আমি ডাক্তার সাহেবের বাসায় গিয়ে ঢুকলাম। ডাক্তার সাহেব আমাকে দেখে বললেন, খোকা কাকে চাও?

আপনাকে।

আমাকে?

জ্বী। ডাক্তার চাচা, খুব একটা জরুরী দরকারে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।

কি কথা?

খুব গোপনে বলতে হবে।

গোপনে? ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এইটুকু ছেলে তোমার আবার কিসের গোপন কথা?

জ্বী, আছে।

আস তাহলে ভিতরে।

আমি তার সাথে ভিতরে গেলাম। একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটা চেয়ারে বসে বললেন, বল।

আমি একবার ঢোক গিলে বললাম, আমাদের পাড়ার শফিক ভাই মুক্তিযোদ্ধা, যেদিন মিলিটারী ক্যাম্প আক্রমণ হয়েছে সেদিন গুলী খেয়ে ধরা পড়েছেন।

ডাক্তার সাহেব চমকে ওঠে ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকলেন।

শফিক ভাই এখন আপনার হাসপাতালে আছেন।

ডাক্তার সাহেব তখনও কোন কথা বললেন না। আমি বললাম, আমরা তাকে উদ্ধার করে নিতে চাই। সেজন্যে আপনার একটু সাহায্য দরকার।

ডাক্তার সাহেব থমথমে গলায় বললেন, ছোট বাচ্চারা তোমরা ছোট বাচ্চাদের মত থাকবে। লাইফ এত সোজা না। লাইফ এডভ্যাঞ্চার উপন্যাসের পৃষ্ঠা না। যাও বাসায় গিয়ে খেলাধুলা কর। যাও।

আপনি আমার কথা শুনেন আগে।

না, আমি শুনব না।

আমি মরীয়া হয়ে বললাম, মিলিটারী ক্যাম্পে যে এটাক হল আমরা সেটাতে সাহায্য করেছি। গুলী পৌছে দিয়েছি। মুক্তিবাহিনী আমাদের সাথে যোগযোগ রাখে। আমাদের কাছে আর্মস আছে। আমরা দরকার পড়লে তাদের আর্মস পৌছে দেই। আমরা—

আমি কিছু জানতে চাই না। তুমি বাসায় যাও।

আমরা কিভাবে করতে চাই সেটা একবার শুধু শুনেন।

না।

শফিক ভাইকে যদি মিলিটারী ক্যাম্পে নিয়ে যায় ভয়ংকর অত্যাচার করে মেরে ফেলবে। ভয়ংকর অত্যাচার—

ডাক্তার সাহেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা আগুন নিয়ে খেলতে যেয়ো না। বাসায় যাও। আমার অনেক কাজ।

ডাক্তার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। রাগে দুঃখে আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। শেষবারের মত চেষ্টা করার জন্যে আমি কান্না আটকাতে আটকাতে বললাম, ডাক্তার চাচা, এখন এমন একটা সময় যেটা আগে কখনো আসে নাই। কেউ ঠিক জানে না এই রকম সময়ে কি করতে হয়। আপনারা বড় আর আমরা ছোট বলে আপনারা কিন্তু আমাদের থেকে বেশি জানেন না —

ডাক্তার চাচা আমার কথা শুনে একটু হকচিয়ে গেলেন। আমি আবার বললাম, আমরা ছোট সেজন্য আমরা কিছু বুঝি না সেটা ঠিক না। আপনিও এক সময় ছোট ছিলেন।

আমি একটু দম নিয়ে বললাম, কিছু করা না হলে আজ কালকের মাঝে শফিক ভাইকে মেরে ফেলবে। তাকে এখনই উদ্ধার করতে হবে। আপনি সাহায্য করলে জিনিষটা সোজা হত। আপনি সাহায্য না করলে জিনিসটা কঠিন হবে, এই পার্থক্য। আমি চলে যাচ্ছিলাম, ডাক্তার সাহেব থামালেন, দাঁড়াও একটু।

আমি ঘুরে বললাম, বলেন।

তোমাদের প্ল্যানটা কি, শুনি।

আমি তখন প্ল্যানটা খুলে বললাম। সত্যি কথা বলতে কি যখন পুরোটা শুনলেন আমার মনে হল শেষের দিকে একটু হাসতে শুরু করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কার মাথা থেকে এটা বের হয়েছে?

আমাদের একজন বন্ধু আছে, নাম— নাম বলতে গিয়ে আমি থেমে গেলাম। মাথা নেড়ে বললাম, কিন্তু তার নাম বলতে পারব না। পারমিশন নাই।

ডাক্তার সাহেব চোখ বড় বড় করে বললেন, পারমিশন নাই?

না। যেটা না জানলেই না সেটা ছাড়া অন্য কিছু আমরা কাউকে কিছু বলিনা।

সেটা খারাপ না। ডাক্তার চাচা একটু থেমে বললেন, আমি শুধু একটা জিনিস জানতে চাই।

কি জিনিস?

মনে কর তোমরা ধরা পড়লে। তখন তোমাদের ধরে শক্ত পিটুনী দিয়ে জিজ্ঞেস করবে কে কে তোমাদের সাথে ছিল। তোমরা কি বলবে? বলবে ডাক্তার চাচা আমাদের সাহায্য করেছেন। তারপর কি হবে? তোমরা বাচ্চা মানুষ তোমাদের হয়তো শক্ত পিটুনী দিয়ে ছেড়ে দেবে। আর আমাকে কি করবে? নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলী করে দেবে। আমার লাশ নদীতে ভেসে যাবে দুই দিন। শেয়াল কুকুর শকুন ছিড়ে ছিড়ে খাবে। আমার দুইটা বাচ্চা আছে, বউ আছে, তাদের লাথি মেরে রাস্তায় বের করে

দেবে। ঠিক বলেছি?

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমরা যদি ধরা পড়ি কখনো আপনার কথা বলব না। কখনো বলব না।

মার কি জিনিস তোমরা জান না। মানুষকে কেমন করে টর্চার করতে হয় সেটা তোমরা জান না। ধরা পড়লে শুধু তুমি না তোমার বাবাও সব কিছু বলে দেবেন! এই যে শফিক ছেলেটা ধরা পড়েছে, মিলিটারী ক্যাম্পে যাবে পরশু তারপর তার কি অবস্থা হবে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বুঝেছ? আমার ইচ্ছে তাকে একটা ইনজেকশান দিয়ে মেরে ফেলি। একটা উপকার করি।

কিন্তু আপনার সেটা করতে হবে না। আমরা তাকে—

সেটা তুমি বলছ। আমি সব কিছু শুনলাম। ডাক্তার চাচা হঠাৎ রহস্যময় ভঙ্গি করে হেসে বললেন, আমি রাজী না।

আমি ভেবেছিলাম ডাক্তার চাচাকে রাজি করিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আবার দেখি বেঁকে বসলেন। আমি আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু, কিন্তু —

ছোট ছেলেদের পাগলামী শুনলে বড়রা কি করে?

কি করে?

ধমক দিয়ে বের করে দেয়। দরকার হলে ঘাড় ধরে বের করে দেয়। এখন আমি তোমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

ডাক্তার সাহেব একটু হেসে আমার পিঠে হাত দিয়ে নরম গলায় বললেন, বাসা থেকে বের হয়ে যাও।

বের হয়ে যাব?

হ্যাঁ। বাসা থেকে বের হয়ে যাও।

আমি বোকার মত বাসা থেকে বের হয়ে এলাম। এর আগে আমাকে কেউ কখনো বাসা থেকে বের করে দেয় নি। এই প্রথম। ডাক্তার সাহেব আমাকে বাসা থেকে বের করে দিলেন, কিন্তু আমার যেটুকু অপমান হওয়ার কথা সেটুকু অপমান হল না। ডাক্তার সাহেবের গলার স্বরে কোন রাগ বা তিরস্কার ছিল না। গলার স্বরে কোন জোরও ছিল না। তিনি শুধু কথাগুলি উচ্চারণ করলেন মনে হল কথাগুলি বলতে হয় বলে বললেন।

আমি অন্যমনস্কভাবে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম, পানের দোকানের কাছাকাছি আসতেই রাশেদ আশরাফ আর ফজলু আমার সাথে এক হল। আশরাফ গলা নামিয়ে বলল, কি বললেন?

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কি বুঝতে পারলি না?

মনে হল প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সব কথা যখন শেষ হল তখন বললেন, আমি রাজি না।

তাই বললেন?

হ্যাঁ, তারপর বললেন তোমাকে এখন ঘাড় ধরে বের করে দেব।

ঘাড় ধরে?

হ্যাঁ, তারপর আমার পিঠে হাত দিয়ে মনে হল বেশ আদর করেই বাইরে বের করে দিলেন। একবারও কিন্তু রাগ হয়ে কিছু বললেন না।

রাশেদ মুখ কাল করে বলল, কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম ডাক্তার সাহেব জয় বাংলার পক্ষে।

হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব জয় বাংলার পক্ষে ঠিকই। কিন্তু আমাদের মত বাচ্চাদের সাথে কোন রকম প্ল্যান করতে রাজি না। ভয় পান।

রাশেদ মুখ শক্ত করে বলল, আমরা যদি কিছু না করি শফিক ভাইকে এমনিতেই মেরে ফেলবে। চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। ডাক্তার সাহেবকে ছাড়াই । যখন দেখবেন আমরা কিছু একটা করে ফেলেছি তার আর কোন উপায় থাকবে না।

আমরা মাথা নাড়লাম।

আশরাফ বলল, আমাদের শেষবার গিয়ে হাসপাতালটা দেখে আসা দরকার। যদি প্ল্যানের কোন রদবদল করতে হয়।

হ্যাঁ। রাশেদ বলল, সবার গিয়ে কাজ নেই। দুইজন গেলেই হবে। আমি আর ইবু যাই। তোরা এখানে অপেক্ষা কর।

ঠিক আছে।

আমি আর রাশেদ একজন মেয়ে মানুষের পেছনে পিছনে হাসপাতালে ঢুকে গেলাম। হাসপাতালের ভিতরে ফিনাইলের গন্ধ, এক জায়গায় একটা রোগী চিৎকার করছে। এক পাশে শফিক ভাইয়ের ঘর, বাইরে একটা রাজাকার বসে সিগারেট টানছে। আমরা সেদিকে গেলাম না। অন্য পাশে দরজার কাছে একটা টেবিল তার উপর একটা খালি ষ্ট্রেচার রাখা। আমার হঠাৎ একটা খটকা লাগল, আমাদের প্ল্যান কাজে লাগানোর জন্যে একটা স্ট্রেচার দরকার, ডাক্তার সাহেবকে তাই বলেছিলাম। তিনি আমাদের সাথে রাজি হন নি কিন্তু ঠিকই একটা স্ট্রেচার রেখেছেন। আমি তাড়াতাড়ি হেঁটে করিডোর পার হয়ে অন্য দিকে গেলাম। ঘরটিতে সারি সারি বিছানাপাতা, তার মাঝে দেয়াল থেকে তিন নম্বর বিছানাটা খালি। ঠিক যেরকম ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম।

আমি রাশেদকে খামচে ধরে বললাম, রাশেদ!

কি?

ডাক্তার চাচা সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন! এই দেখ খালি বিছানা! ঐ দেখ স্ট্রেচার!

তাহলে! তোকে যে বললেন রাজি না?

হঠাৎ করে আমি সব বুঝে গেলাম! বললাম, বুঝলি না? আমরা যদি ধরা পড়ে যাই কিছুতেই কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না ডাক্তার সাহেব আমাদের সাথে আছেন।

কেন?

মনে নেই আমাকে বলেছেন রাজি না, শুধু তাই না আমাকে বের করে দিলেন বাসা থেকে!

কিন্তু স্ট্রেচার? খালি বিছানা?

হাসপাতালে স্ট্রেচার থাকবে না? একটা বেড খালি হতে পারে না?

রাশেদ আমার দিকে তাকিয়ে খুশিতে হেসে ফেলল! তাহলে আমাদের আর কোন সমস্যা নাই!

না।

দুপুরে আমরা সবাই বাসায় ফিরে গিয়ে গোসল সেরে নিলাম। কেউ যদি আমাদের লক্ষ্য করে ঘূণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারবে না আমরা আর কয়েক ঘন্টার মাঝে কি সাংঘাতিক একটা কাজ করতে যাচ্ছি। কিছু একটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে, গোলাগুলী হতে পারে, কেউ একজন মরেও যেতে পারি। কিন্তু সেই সব মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছি।

খাবার টেবিলে আম্মা বললেন, কি রে ইবু, তুই এত চুপচাপ কেন?

না, এমনি।

জানিস তো আমরা চলে যাব।

কবে?

এই কাল না হয় পরশু। ফরহাদ সাহেব, অরুর আব্বা আজ নৌকা ঠিক করেছেন।

ও।

বাইরের খোঁজ খবর কিছু জানিস?

কিসের খোঁজ খবর?

শফিক কেমন আছে, এইসব।

একটু একটু নাকি হাঁটতে পারেন। আমার গলা কেপে গেল হঠাৎ, কাল পরশুর মাঝে নাকি ক্যাম্পে নিয়ে যাবে।

আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

১৭.

পাঁচটার দিকে আমি বাসা থেকে বের হলাম। হাতে কয়েকটা গল্পের বই, কোন বইয়ে আমার নাম লেখা নেই আজগুবি একটা নাম লিখে রেখেছি। বাসা থেকে বের হয়ে ফজলুর বাসায় গেলাম। ফজলুকে নিয়ে আশরাফের বাসায়। আশরাফ একটা বল হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। আমার আর ফজলুর খালি পা আশরাফের পায়ে এক জোড়া টেনিশ শু। খালি পায়েই আমরা ভাল দৌড়াদৌড়ি করতে পারি, টেনিস শু না পরলে

আশরাফ নাকি ভাল ছুটতে পারে না। আমরা সবাই দুটি করে শার্ট পরেছি একটা উপরে আরেকটা নিচে, দুইটা দুই রকম। উপরের শার্টটা খুললেই ভিতর থেকে অন্য শার্ট বের হয়ে যাবে। বেশ গরম আজকে, দুইটা সার্টে মনে হচ্ছে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। সার্ট ছাড়া আরো একটা জিনিস আছে, পকেটে, একটা করে রুমাল। দুই মাথা গিট মেরে একটা টিউবের মত রাখা আছে মাথা দিয়ে গলিয়ে মুখোসের মত পরে নেয়া যাবে। চোখের জায়গা কেটে গর্ত করে রেখেছি, পরার পর দেখতে যেন অসুবিধে না হয়। বাসায় আয়নার সামনে পরে দেখেছি, বিদঘুটে লাগে দেখতে, কেউ আর আমাদের চেহারা দেখতে পারবে না।

হাসপাতালের কাছাকাছি এসে আমরা একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়ালাম।

আমি আশরাফ আর ফজলুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসার মত ভঙ্গি করলাম, হাসিটা খুব ভাল কাজ করল বলে মনে হল না। রাশেদ আমাদের সাথে নেই, সে স্টেনগান নিয়ে আসবে, সোজাসুজি হাসপাতালে আমাদের সাথে দেখা করার কথা। আশরাফ বলল, এখন তাহলে আমরা আলাদা হয়ে যাই?

হ্যাঁ।

আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম। পেটের ভিতরে কেমন জানি করছে— ফাইনাল পরীক্ষার আগে ঠিক যখন প্রশ্ন দেয় তার আগে যেমন লাগে। ফজলু শুকনো মুখে বলল, একটু ভয় ভয় লাগছে।

আমি বললাম, লাগতেই তো পারে।

কি মনে হয়? ঠিক ঠিক হবে তো সব কিছু?

একশবার হবে! আশরাফ বুকে থাবা দিয়ে বলল, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এসেছি আজ।

আমি আশরাফকে বললাম, দে তোর বলটা।

আশরাফ আমাকে বলটা দেয়। আমি বললাম, দেখা হবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে!

ফজলু দাঁত বের করে একটু হাসার চেষ্টা করল, আশরাফ কিছু বলল না।

আমি আমার গল্পের বই এবং আশরাফের বলটা নিয়ে হাসপাতালের রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকি। হাসপাতালের ঠিক সামনে দিয়ে বড় রাস্তাটা গিয়েছে, রাস্তার অন্য পাশে একটা পুকুর। পুকুরের পাশে একটা গোরস্থান। হাসপাতালের এত কাছে একটা গোরস্থান রাখা মনে হয় ভাল কাজ হয় নাই। রোগীদের মন দুর্বল হয়ে থাকবে সারাক্ষণ, কিন্তু আমাদের প্ল্যানটা কাজে লাগাতে খুব সুবিধে হয়েছে। গোরস্থানটা অনেক পুরোনো, দেয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে ভিতরে গাছ পালায় ঢাকা, দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে। গোরস্থানের অন্য পাশে বস্তির মত, কিছু দিনমজুর ছোট ছোট ঝুপড়ির মত ঘরে থাকে। তার অন্য পাশ দিয়ে আরেকটা রাস্তা নদীর ঘাটের দিকে গিয়েছে। আমি গোরস্থানের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম কেউ নেই এবং কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না আমার হাতের বল এবং বইগুলি ভিতরে ফেলে

দিলাম। এটা আমাদের প্ল্যানের একটা অংশ।

গোরস্থানে কাজ শেষ করে আমি হাসপাতালে ফিরে এলাম। বেশি আগে এসে লাভ নেই তাই একটু ঘুরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে ছয়টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগে হাসপাতালে এসেছি। একা একা না ঢুকে কিছু মানুষের সাথে ঢুকে গেলাম। ভাবখানা তাদের সাথে এসেছি। ভিতরে ঢুকে হাসপাতালের বড় একটা ওয়ার্ডে নির্জীব দেখে একজন রোগী বের করে তার বিছানার কাছে বসে রইলাম। ভাবখানা তার সাথে দেখা করতে এসেছি। বসে থাকতেই ডাক্তার সাহেবকে দেখলাম, রোগীদের দেখে দেখে যাচ্ছেন। আমাকে দেখলেন, দেখে চিনতে পারলেন বলে মনে হয় না। খানিকক্ষণ পর ফজলুকে দেখলাম আরো কোণায়, আরো কয়জন মানুষের পিছনে পিছনে এসে ঢুকছে। আশরাফকে দেখলাম, করিডোর ধরে হেঁটে গেল, নিশ্চয়ই নিচে কোথাও অপেক্ষা করবে। রাশেদকে দেখলাম না। তার কাছেই স্টেনগান, সেই সবচেয়ে জরুরী। যদি কোন কারণে না আসতে পারে আমাদের পুরো প্ল্যানটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আমি বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকি। লোকজন যাচ্ছে, আসছে কেউ আমাকে বা ফজলুকে লক্ষ্য করছে না। একটু পরে যখন প্রলয় কাণ্ড শুরু হবে তখন সবাই দেখবে চোখ বড় বড় করে !

শেষ মুহূর্তে রাশেদকে দেখলাম ভিতরে এসে ঢুকল। হাতে একটা বাজারের ব্যাগ কয়েকটা কলা উঁকি দিচ্ছে ভিতর থেকে। নিচে নিশ্চয়ই স্টেনগান আছে। রাশেদ একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে হেঁটে গেল, আমাদের চিনছে সেরকম ভান করল না।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকি। আর কয়েক মিনিট, তারপর এসে যাবে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। কি হবে তখন ? সত্যি কি আমরা পারব শফিক ভাইকে বাঁচাতে ? সত্যি কি সব কিছু হবে পরিকল্পনা মত ? গোলাগুলী কি হবে ? কেউ কি মারা যাবে আজ ? আমাদের ? রাজাকারদের ? এখন আর ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে, আমরা শুধু করে যাব যেটা করার কথা।

আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে দম আটকে যাবে হঠাৎ। কান খাড়া করে বসে আছি, আর ঠিক তখন ঢং ঢং করে ছয়টা বাজল পেটা ঘড়িতে।

আমি সাবধানে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম ফজলুও উঠে দাঁড়াল। আশরাফ আর রাশেদ কোথায় আছে জানি না, কিন্তু যেখানে থাকুক এখন নিশ্চয়ই তারাও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে মনে বললাম, হে খোদা তুমি সব কিছু ভালয় ভালয় শেষ করিয়ে দিও।

আমি খুব শান্ত ভঙ্গিতে বাইরে এলাম। করিডোর ধরে হেঁটে এখন দশ সেকেন্ডের মাঝে আমাদের শফিক ভাইয়ের সামনে যাবার কথা। তাড়াহুড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। দশ সেকেন্ড অনেক সময়। আমি মনে মনে গুণতে থাকি এক হাজার এক, এক হাজার দুই, এক হাজার তিন . . .

আমি না তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ফজলু আমার পাশে–পাশে হাঁটছে। করিডোর ধরে ঘুরে যেতেই আমরা শফিক ভাইয়ের ঘরটা দেখলাম। ঘরের সামনে রাজাকারটি আমাদের দিকে পিছনে ফিরে বসে আছে। সাথে আর কেউ নেই, এই সময়টাতে পুলিশ দুইজন চলে যায় ফিরে আসে আরেকটু রাতে। সে কারণেই এই সময়টা বেছে নেয়া হয়েছে। রাজাকারটি আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে, তার মানে আগে আমার আর ফজলুর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমার বুকের ভিতর হঠাৎ রক্ত ছলাৎ করে উঠে।

সামনে হঠাৎ করে রাশেদ আর আশরাফকে দেখলাম। রাশেদের হাত বাজারে ব্যাগের মাঝে, তার মানে নিশ্চয়ই স্টেনগানটা ধরেছে হাতে দিয়ে।

আমি আর ফজলু আরেকটু এগিয়ে গেলাম। রাশেদ আর আশরাফ আরেকটু এগিয়ে এল। আমি ফজলুর দিকে তাকালাম, ফজলু আমার দিকে তাকাল তারপর দুজন এক ছুটে রাজাকারটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড ধাক্কায় রাজাকারটি চেয়ার থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়ল। হাতে তখনো রাইফেলটা ধরে রেখেছে, এক হ্যাচকে টানে রাইফেটা সরিয়ে নিল ফজলু। আমি গায়ের জোরে একটা লাথি মারলাম লোকটার মাথায়, আরেকটা মারার আগেই রাশেদের হাতে স্টেনগান বের হয়ে এসেছে, হিংস্র গলায় বলল, শুওরের বাচ্চা চোখ বন্ধ কর।

রাজাকারটি চোখ বন্ধ করল।

ঘরের ভিতর ঢোক— খবরদার মাটি থেকে উঠবি না। একটু উল্টা পাল্টা কিছু করলে গুলী।

রাশেদকে দেখে মনে হল দরকার হলে সত্যি সে গুলী করে দেবে। রাজাকারটি চোখ বন্ধ করে বুকে হেঁটে শফিক ভাইয়ের ঘরে ঢুকতে থাকে। দেখলাম ভয়ে কাঁপছে সে থরথর করে।

রাশেদ তার মুখের মুখোসটা পরে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়, তারপর জানালার কাঁচে কয়েকটা গুলী করে বসে। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে পড়ে, গুলীর শব্দ আর ধোঁয়ায় হঠাৎ জায়গাটা কেমন জানি ভয়ংকর হয়ে উঠে। রাশেদ চিৎকার করে বলল, এটা একটা কমান্ডো এটাক, কেউ এগিয়ে আসবেন না। এক প্ল্যাটুন মুক্তিযোদ্ধা আছে এখানে, রাজাকারগুলিকে শেষ করে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কেউ এদিকে আসবে না।

লোকজন হাসপাতালের নানা অংশ থেকে উঁকি মারে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না। পাশের ওয়ার্ডে মনে হল কয়েকজন ছুটে কোথাও লুকিয়ে যাচ্ছে, আমরা জানতাম এই হাসপাতালে কয়েকজন গুলী–খাওয়া রাজাকারও আছে।

আমাদের কাজ ভাগ করা ছিল, এখন দ্রুত কাজে লেগে পড়ি। ফজলু রাজাকারটির দুই হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধতে থাকে। একটা রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে ঘাড়ের উপর রাইফেলটা চেপে রাখে। আশরাফ রুমাল দিয়ে তৈরি মুখোশটা পরে বের হয়ে যায় স্ট্রেচার আনতে, রাশেদ স্টেনগান হাতে পাহারা দেয় সবাইকে।

আমি মুখোসটা পরে নিতে নিতে শফিক ভাইয়ের বিছানার কাছে ছুটে গেলাম, তার মুখে লম্বা লম্বা দাড়ি, লম্বা লম্বা চুল, দেখে কেমন যেন অল্প বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের মত দেখাচ্ছে। শফিক ভাই অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন তার মুখে অবিশ্বাস। আমি গলা মোটা করে বললাম, কমরেড শফিক। মুক্তিযোদ্ধার একটা স্পেশাল কমান্ডো দল আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

আমাকে?

হ্যাঁ। বাইরে দুইটা মোটর সাইকেল অপেক্ষা করছে, নদীতে একটা স্পীড বোড— আমি হঠাৎ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, পরে বলব সব কিছু এখন চলেন।

আশরাফ স্ট্রেচার নিয়ে আসতে সেখানে শফিক ভাইকে শুইয়ে আমরা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে চারজন চারদিকে ধরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। শফিক ভাই কখনো মোটা সোটা মানুষ ছিলেন না এখন মনে হয় আরো শুকিয়েছেন।

হাসপাতালের রোগী, নার্স এবং ডাক্তার এগিয়ে আসছিল। মিলিটারী হলে ভয় পেত কিন্তু মুক্তিবাহিনী তো নিজেদের লোক, তাও ভয় পাবে কেন? রাশেদ একটা হুংকার দিয়ে বলল, খবরদার কেউ কাছে আসবেন না। আমাদের এক্ষুনি দুই নম্বর দলের কাছে যেতে হবে।

লোকজন তবু কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। কৌতূহল বড় সাংঘাতিক জিনিস।

আমরা ছুটে যেতে থাকি। সামনে একটা ছোট করিডোর সেখানে এসে আমরা স্ট্রেচার নামালাম। রাশেদ ছুটে গেল সামনে, লোকজন তখনো ভীড় করে আসছে। শফিক ভাইকে সব কিছু বলার জন্যে আমাদের খানিকক্ষণ সময় দরকার এত ভীড় হলে তো ঝামেলা হয়ে যাবে। রাশেদ ভয়ঙ্কর চিৎকার করে সামনে লাফিয়ে পড়ে স্টেনগানটি উপরে তুলে গুলী করতে শুরু করল। ঝনঝন করে কি যেন ভেঙে পড়ে, ধোঁয়া, গুলী, লোকজনের হুটোপুটি সব মিলিয়ে মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ হয়ে যায়। কৌতূহলী লোকজন এবারে ভয় পেয়ে সরে যায়, সাথে সাথে আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিলাম। কেউ দেখার আগে শফিক ভাইকে তুলে টেনে একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম, ময়লা জঞ্জালের একটা ঘর, আগে থেকে আমরা এটা ঠিক করে রেখেছিলাম। তার হাতে একটা শার্ট আর ছোট একটা প্যাকেট দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, এই শার্টটা পরে নেন। প্যাকেটে একটা কাঁচি আছে দাড়ি কেটে নিয়ে বড় ওয়ার্ডের তিন নম্বর বিছানায় গিয়ে শুবেন। বিছানাটা আপনার জন্য খালি করা আছে। শফিক ভাই কিছু বুঝতে পারছিলেন না, অবাক হয়ে বললেন, আমাকে না উদ্ধার করে নেবে—

সবাই জানবে আপনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি আসলে এখানেই থাকবেন। আপনি হচ্ছেন আহত রাজাকার সালামত আলী! আপনার পকেটে গ্রামের মানুষের চিঠি আছে। সময় পেলে হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে নেবেন, যেন আপনার হাতে গুলী লেগেছে।

শফিক ভাইয়ের মুখে হঠাৎ একটা হাসি ফুটে উঠে। তিনি আমার ঘাড়ে একটা থাবা দিয়ে বললেন, পাজী ছেলের দল!

আমি দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মুখোসে মুখ ঢাকা শফিক ভাই সেটা দেখতে পারলেন না। তা ছাড়া আমার উত্তেজনায় আমার বুকের মাঝে ঢাকের মত শব্দ হচ্ছে, যতক্ষণ না স্ট্রেচারটা চাদর ঢেকে নিয়ে এখান থেকে সরে যেতে না পারছি আমরা বা শফিক ভাই কেউই নিরাপদ না। আমি ছোট ঘরটা থেকে বের হয়ে আসতেই ফজলু বলল, সামনে থেকে দেখে এসেছি সব ঠিক আছে।

চল তাহলে।

আমরা চাদরে ঢাকা স্ট্রেচারটা নিয়ে ছুটতে থাকি। শফিক ভাইয়ের একটা বালিশ আর রাজাকারের রাইফেলটা এখানে আছে। ভাল করে লক্ষ্য করলে হয়তো বোঝা যাবে এখানে কোন মানুষ নেই, কিন্তু আমাদের কেউ ভাল করে লক্ষ্য করার সুযোগ পাবে না। বাইরে এতক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরা তার মাঝে ছুটে গিয়ে গোরস্থানে লুকিয়ে যাব।

হাসপাতালের বাইরে এসে সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি। রাস্তায় নেমে পিছনে ফিরে তাকালাম, তারপর আবার ছুটতে থাকলাম। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে স্ট্রেচারটা একবার নিচে রেখে সবাই হাত বদল করে নিলাম। কিছু লোক আমাদের খুব কাছাকাছি চলে আসছিল, রাশেদ তাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরে আকাশে এক পশলা গুলী করে দেয়। লোকজন পিছিয়ে যায় সাথে সাথে। কেউ আর কাছে আসতে সাহস পায় না, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের লক্ষ্য করতে থাকে।

আমরা প্রাণপণে ছুটতে থাকি। আর অল্প কিছুদূর তারপরেই গোরস্থান।

হঠাৎ করে কানের কাছে দিয়ে শীষের মত একটা শব্দ হল সাথে সাথে একটা গুলীর শব্দ শুনতে পেলাম।

গুলী করছে আমাদের!

থামবি না। থামবি না কেউ।

আমরা প্রাণপণে ছুটে যেতে থাকি। আর কয়েক পা তারপরই ঢুকে যাব গোরস্থানে। শীষের মত শব্দ করে আরো কয়েকটা গুলী ছুটে গেল আশে-পাশে দিয়ে আমরা তার মাঝে ছুটতে ছুটতে গোরস্থানে ঢুকে গেলাম। স্ট্রেচারটা মাটিতে রেখে রাশেদ হাপাতে হাপাতে বলল, সবাই ঠিক আছিস?

হ্যাঁ

ভেরী গুড, কাপড় পাল্টে সবাই পালাবার জন্যে রেডী হ। আমরা মুখোস খুলে নেই। উপরের শার্টটা খুলে ভিতরের অন্যরকম শার্টটা বের করে নিলাম। তারপর আগে ফেলে রাখা বইগুলি আর বলটা তুলে ভাগাভাগি করে নিয়ে গোরস্থানের অন্য পাশে ছুটতে থাকি। ছমছমে অন্ধকার গোরস্থান কিন্তু এই প্রথমবার আমাদের কারো ভূতের ভয় হল না।

গোরস্থানের অন্যপাশে একটা বস্তির মত। অন্ধকারে আমাদের বের হতে দেখে কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

আমরা আলাদা আলাদা বের হচ্ছিলাম। আমার সাথে আশরাফ, কি বলব ভেবে না পেয়ে প্রায় সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। মিথ্যে সব সময় সত্যির কাছাকাছি করে বলতে হয়। আমি বললাম, মুক্তিবাহিনী!

মুক্তি বাহিনী?

হ্যাঁ, দেখে ভয় লেগে গেছে! এত সব অস্ত্র।

লোকগুলি একজন আরেকজনকে বলল, মুক্তি ফৌজ এসেছে নাকি! একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মুক্তিবাহিনীকে কোন ভয় নেই। মুক্তিবাহিনী হচ্ছে নিজের মানুষ! ভয় হচ্ছে মিলিটারীকে।

অন্য মানুষগুলিও মাথা নাড়ে, বলে, হ্যাঁ। মিলিটারী আর রাজাকার।

আশরাফ বলল, যুদ্ধ শুরু হয় যদি? আমার অনেক ভয় করে।

ভয়ের কিছু নাই। মাথা নিচু করে শুয়ে থাকতে হয়।

আমি বললাম, চল বাসায় যাই। লোকগুলি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, বাসায় যাও। রাত্রিবেলা বাইরে থাকা ঠিক না।

আমি আর আশরাফ তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলাম। যারা গুলী করছে তারা যখন খোঁজাখুজি শুরু করবে তখন আশেপাশে থাকা ঠিক নয়।

আমরা দশ মিনিটের মাঝে বাসায় পৌছে গেলাম। রিক্সা করে যখন যাচ্ছি তখন দেখি আরেকটা রিক্সায় করে ফজলু আর রাশেদ বের হয়ে গেল, মুশকো জোয়ান একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সাটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমরা সবাই ভালয় ভালয় ফিরে এসেছি। তার মানে শফিক ভাই বেঁচে গেলেন। হাসপাতালে মিলিটারী রাজাকারের নাকের ডগায় শফিক ভাই এখন সুস্থ দেহে ঘুরে বেড়াবেন।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে আব্বা আম্মাকে বললেন, মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা আরেকটা অপারেশান করছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। হাসপাতালে নাকি রাজাকার মিলিটারী পুলিশের ভীড়, তার মাঝে মুক্তিবাহিনীর একটা কমান্ডো দল এসে হাজির।

সত্যি?

হ্যাঁ। প্রচণ্ড গোলাগুলী যুদ্ধ। ছয় সাতটা মিলিটারী নাকি শেষ। তারপরে কি করেছে জান?

কি?

আব্বা চোখ বড় বড় করে বললেন, শফিককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে!

সত্যি?

আম্মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছিস ইবু? তোর শফিক ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।

আমি অবাক এবং খুশি হওয়ার ভান করতে থাকি। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে নিল? কোথায় নিল?

আব্বা মাথা নেড়ে বলল, সেটা কেউ জানে না। একেবারে নাকি ম্যাজিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আম্মা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ইশ! কি সাহস ছেলেগুলির। আব্বা গম্ভীর হয়ে বললেন, খুব অর্গানাইজড। ওদের দলে নাকি ছোট ছোট ছেলেরাও আছে? এই ইবুর সাইজের।

সত্যি?

হ্যাঁ। প্রথমে তারা নাকি ছুটে এসে গ্রেনেড ছুঁড়ে চলে গেছে! দাঁত দিয়ে পিন খুলে এই রকম করে ছুঁড়ে দেয়— আব্বা হাত দিয়ে গ্রেনেড ছোড়া দেখালেন।

আম্মা আবার মাথা নেড়ে বললেন, ইশ! কি সাহস!

আব্বা বললেন, এখন সরে যেতে পারলে হয়। মিলিটারীর বিরাট একটা দল বের হয়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। হাজার হলেও একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। দোয়া কর যেন ছেলেগুলি সময় মত সরে যেতে পারে।

দোয়া তো করিই। সব সময় করি।

আব্বা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই জানিস নাকি কিছু?

আমি খেতে খেতে বিষম খেলাম, বললাম, নাহ্।

তোর বন্ধু রাশেদ নিশ্চয়ই জানবে। সে হচ্ছে ভ্রাম্যমান খবরের কাগজ— আব্বা হো হো করে হাসলেন, তার মনটা আজ খুব ভাল।

আমি মাথা নাড়লাম, কাল যখন আসবে জিজ্ঞেস করে দেখব।

১৮.

কয়দিন পর আমরা শহর ছেড়ে চলে গেলাম। প্রথমে গেল ফজলুরা। একেবারে হঠাৎ করে চলে গেল, যাবার আগে আমাদের সাথে দেখাও করে যেতে পারে নি। তারপর গেল আশরাফেরা। তার আব্বা সবাইকে নিয়ে ঢাকা চলে গেলেন। ঢাকা শহর নাকি এখন সবচেয়ে নিরাপদ। তারপর আমাদের যাবার দিন এসে গেল। দুটি নৌকা ঠিক করা হয়েছে, নৌকা করে আমরা এবং অরু আপারা গ্রামের ভিতরে চলে যাব। যাবার আগের দিন আমি খুব কষ্ট করে রাশেদের সাথে দেখা করতে গেলাম। শহরে খবর ছড়িয়ে গেছে ছোট ছোট ছেলেরা মুক্তিবাহিনীর হয়ে কাজ করছে, তাই আব্বা আর আমাকে বাসা

থেকে বের হতে দেন না।

রাশেদ যখন শুনল আমিও চলে যাচ্ছি তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বলল, সত্যি চলে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ। আব্বা আর থাকতে চাইছেন না। মিলিটারী ক্যাম্পের এত কাছে থাকা খুব নাকি ভয়ের ব্যাপার।

রাশেদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে তাহলে সব একা একা করতে হবে!

কি করবি একা?

পারমিশান নাই— বলেই রাশেদ হেসে ফেলল। বলল, তোকে বলতে কোন দোষ নেই! তুই আর আমি তো একই। তারপর গলা নামিয়ে বলল, নদীর উপরে যে ব্রীজটা আছে সেটা উড়াবো। ফ্রগম্যান এসেছে, সাথে লিমপেট মাইন।

ফ্রগম্যান?

হ্যাঁ পায়ে ব্যাঙের পায়ের মত ফ্লীপার লাগিয়ে নদীতে সাঁতরে সাঁতরে যায়।

সত্যি?

হ্যাঁ।

দিন-তারিখও ঠিক করা আছে কিন্তু সেটা এখনো কেউ জানে না। একটা যুদ্ধ হবে কমলগঞ্জে। অনেক বড় যুদ্ধ। তখন একটা পাকাপাকি ফ্রন্ট খুলবে এখানে। তার আগে আগে যেন কোন সাপ্লাই যেতে না পারে।

সত্যি?

হ্যাঁ।

আমি কি বলছি জানিস?

কি?

ব্রীজটা আগেই না উড়াতে। ঠিক যখন একটা মিলিটারী ট্রেন ব্রীজের উপরে থাকবে তখন 'বুম'! রাশেদ দুই হাত দিয়ে আমার চোখের সামনে ব্রীজটা উড়িয়ে দিল।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, কেমন করে জানবি কোনটা মিলিটারী ট্রেন? ভুল করে যদি প্যাসেঞ্জার ট্রেন উড়িয়ে দেয়—

না না সেটা তো করাই যাবে না। রাশেদ মাথা নেড়ে বলল, ধর কমলগঞ্জে যুদ্ধ শুরু হল। তখন একটা ট্রেন বোঝাই করে মিলিটারী গোলাবারুদ তো ওদিকে যাবেই। তখন ধর আমরা কেউ যদি স্টেশনে থাকি যখন দেখব ট্রেনটা ছাড়ছে খবর পাঠিয়ে দিলাম, ঠিক যখন ব্রীজের উপর আসবে — 'বুম'! রাশেদ আবার ব্রীজটা উড়িয়ে দিল।

কেমন করে খবর পাঠাবি?

সেটা এখনো ঠিক করি নি। দিনের বেলা আয়না দিয়ে —

যদি মেঘলা দিন হয়?

রাশেদ একটু হেসে বলল, সেটা ভেবে একটা কিছু উপায় বের করে ফেলব! মনে নাই শফিক ভাইকে কেমন করে উদ্ধার করলাম।

ঘটনা মনে পড়ে যাওয়ায় আমরা দুজনেই একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে হাসতে থাকি। আমি গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শফিক ভাই কেমন আছেন এখন?

ভাল, এতদিনে বর্ডারের কাছে পৌঁছে গেছেন। হাসপাতালে থাকার সাহস পেলেন না। পরদিন ভোরেই একটা রিক্সা নিয়ে বের হয়ে গেলেন, সবার সামনে দিয়ে!

আমি আর রাশেদ আবার আনন্দে হাসতে থাকি। রাশেদ হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, তুই থাকলে খুব ভাল হত। সবাই চলে যাচ্ছে, আমি একা হয়ে গেলাম।

রাশেদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে কেমন জানি একটা দুঃখী-দুঃখী মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কি করব বল? ছোট হলে বড় অসুবিধে, সবসময় বড়দের কথা শুনতে হয়।

তা ঠিক।

আমি আর রাশেদ আরো অনেকক্ষণ কথা বললাম, দুজনে হেঁটে হেঁটে গেলাম রাস্তা দিয়ে তারপর আবার ফিরে এলাম। রাশেদ তখন আমাকে চায়ের দোকানে নিয়ে মালাই দিয়ে চা খাওয়ালো। ফিরে আসার সময় রাশেদ হঠাৎ আমার হাত ধরে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, তুই আমার বন্ধু হবি?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, কেন? আমি কি তোর বন্ধু না?

একেবারে প্রাণের বন্ধু। সারা জীবনের বন্ধু। মরে গেলেও যে বন্ধু থেকে যায় সেই বন্ধু। হবি?

আমি মাথা নাড়লাম, হব।

রাশেদ তখন খুশি হয়ে একটু হাসল। ফিসফিস করে বলল। আমার কোন প্রাণের বন্ধু নাই— মানে আগে ছিল না। একজন বন্ধু খুব দরকার যাকে সবকিছু বলা যায়।

সবকিছু কি?

কত কি বলা যায়! তুই কি আমার কিছু জানিস? আমি কে? আমার বাবা কি? কি করে? কিছু জানিস?

আমি মাথা নাড়লাম, না, জানি না।

মাঝে মাঝে আমার কৌতূহল হয়েছে সত্যি কিন্তু কখনো রাশেদকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। রাশেদ একটু হেসে বলল, তুই যখন আমার প্রাণের বন্ধু হলি তোকে কেউ একদিন সব কিছু বলবে। আজকাল শুধু ভয় হয় যে কোনদিন কেউ আমরা মরে যাব।

তা ঠিক।

রাশেদ হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, যদি আমি কোনদিন মরে যাই, তুই আমার কথা মনে রাখবি?

রাশেদ কেন এটা বলল আমি জানি না কিন্তু আমার বুকটা হঠাৎ ধ্বক করে উঠল, আমি রাশেদের হাত ধরে বললাম, ধুর বেকুব কোথাকার! তুই মরবি কেন?

রাশেদ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ মরার কথা বলা ঠিক না।

আমরা কত ছোট কিন্তু আমাদের কিনা এখনই মরে যাওয়া বেঁচে থাকা নিয়ে ভাবতে হয়!

আমরা রওনা দিয়েছি ভোরে। দুটি নৌকায় আমরা আর অরু আপারা ভাগাভাগি করে যাচ্ছি। নৌকাদুটি যাচ্ছে নদীর তীর ঘেঁষে। মাঝে মাঝে মিলিটারী গানবোট এসে পড়ে তখন লুকিয়ে যেতে হয়, কাছাকাছি কোন ছোট খাল থাকলে সেখানে ঢুকে পড়তে হয়। দুটি নৌকা একটা আরেকটার কাছাকাছি যাচ্ছে। দুপুর বেলা এক জায়গায় থেমে নৌকায় কিছু রান্না করা হল খাওয়ার জন্যে। ডালের মাঝে ডিম ভেঙে দিয়ে অদ্ভুত একটা রান্না কিন্তু খেতে খারাপ না। খিদে লাগলে অবশ্যি সবকিছু খেতে ভাল লাগে, নৌকায় সারাদিন শুধু বসেই আছি তবু দুপুর বেলা ভীষণ খিদে পেয়েছিল।

দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করে আবার নৌকা ছেড়ে দিল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। আমি নৌকার ছইয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চারিদিকে এক ধরনের সুমসাম নীরবতা। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হচ্ছে কিন্তু খানিকক্ষণ বসে থাকলে সেই শব্দ আর কানে আসে না। মনে হয় কোথাও কোন শব্দ নেই। আকাশে তারা উঠেছে। কত লক্ষ লক্ষ তারা, আমি আবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। একেকটা পৃথিবী থেকে কত কোটি কোটি মাইল দূরে। কত বড় এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর পৃথিবী কত ছোট! সেই ছোট পৃথিবীতে আমরা নিজের দেশের মানুষ নিজের দেশে নিজের ঘর বাড়িতে থাকতে পারি না। তাড়া খেয়ে বনের পশুর মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়!

নৌকা দুটি বড় নদী থেকে বাঁক নিয়ে ছোট একটা নদীতে ঢুকে পড়ল। মাঝি হালকা গলায় বলল, আর ভয় নাই গো!

অরু আপা নৌকার ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভয় নাই?

পাঞ্জাবী গো ভয় নাই। এটা নীল গাং। নীল গাংয়ে গানবোট ঢুকে না।

কেন।

জয় বাংলা এখনো। হা হা হা— মাঝি খুশিতে হাসতে থাকে।

আর কতক্ষণ যেতে হবে আমাদের?

দেরি আছে মা। ভোর রাতের আগে না।

অরু আপা নৌকার ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, ইশ! কি সুন্দর। আমাকে ছইয়ের উপর দেখে বললেন, ওমা! তুই এখানে বকের মত বসে আছিস! সর, জায়গা দে। আমিও বসব।

আমি জায়গা করে দিলাম। অরু আপা আমার পাশে বসে বললেন, দেখিস পড়ে যাসনে যেন!

পড়ব কেন। তুমি কি পড়ে যাবে?

আমি বুড়োধারী মানুষ পড়ব কেন? তুই ছোট তাই বললাম।

তোমরা মনে কর আমরা ছোট বলে কিছু পারি না?

অরু আপা আমার গলায় উত্তাপটুকু বুঝতে পেরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আচ্ছা যা আর বলব না। তোরা আর ছোট না, তোরা বড়। অরু আপা বক্তৃতা দেওয়ার মত করে বললেন, উনিশ শ একাত্তর সনের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই দেশের শিশুদের কাছে থেকে তাদের শৈশবকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অরু আপা কথাটি বললেন ঠাট্টা করে কিন্তু আমার মনে হয় কথাটা সত্যি। আমার জন্যে সত্যি। আমার আর রাশেদের জন্যে সত্যি। ফজলু আর আশরাফের জন্যে সত্যি।

আমরা দুজন খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। এক সময় অরু আপা গলা নামিয়ে বললেন, তোদের শফিক ভাইয়ের কোন খোঁজ জানিস? কোথায় আছে এখন?

আমি চুপ করে রইলাম।

অরু আপা আমার দিকে তাকালেন, জানিস, তাই না?

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

অরু আপা আবার বললেন, বল না কোথায় আছে। কেমন আছে। কারা উদ্ধার করল, কোথায় নিল। বল না।

টপ সিক্রেট। বলার পারমিশন নাই।

প্লীজ আমাকে বল। আমি কাউকে বলব না। এই তোর গা ছুঁয়ে বলছি।

গা ছুঁয়ে বললে কি হয়?

মনে হয় বলে দিলে গায়ে চুলকানী হয়।

যাও! বল খোদার কসম।

খোদার কসম।

কাউকে বলবে না?

কাউকে বলবো না।

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, তার আগে বল দেখি শফিক ভাইকে হাসপাতাল থেকে কারা উদ্ধার করেছে?

মুক্তিবাহিনীরা একটা সুইসাইড স্কোয়াড। স্পেশাল ট্রেনিং পাওয়া একটা কমান্ডো ইউনিট।

কতজন ছিল?

ষোল সতর জন।

তারা শফিক ভাইকে কেমন করে নিয়েছে।

প্রথমে মোটর সাইকেলে তারপর স্পীড বোটে।

হাসপাতালে কি যুদ্ধ হয়েছিল?

হ্যাঁ, একটা ছোট খাট যুদ্ধ হয়েছিল।

কেউ মারা গিয়েছিল?

চারজন রাজাকার আর দুইজন মিলিটারী।

আমি খুকখুক করে হেসে ফেললাম। অরু আপা বললেন, কি হল হাসছিস কেন?

তুমি কাউকে বলবে নাতো?

না, বলবো না।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, শফিক ভাইকে উদ্ধার করেছি আমরা।

অরু আপা মনে হল আমার কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, কি বললি?

শফিক ভাইকে উদ্ধার করেছি আমরা। আমি, রাশেদ ফজলু আর আশরাফ।

কি বললি? কি বললি? অরু আপা তখনো কিছু বুঝতে পারছেন না।

সুইসাইড স্কোয়াড, কমান্ডো, এই সব বানানো কথা। আমরা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। আসলে ছিলাম মাত্র আমরা চারজন।

তোরা চারজন? তোরা?

হ্যাঁ।

শফিককে কোথায় নিলি? কেমন করে নিলি?

কোথাও নেই নি। আমরা শুধু ভান করেছি তাকে নিয়ে গেছি। খালি স্ট্রেচার কাপড় দিয়ে ঢেকে ছুটে পালিয়ে গেছি। শফিক ভাই একটা ছোট ঘরে লুকিয়েছিলেন, দাড়ি টাড়ি কেটে কাপড় ফেলে ভীড়ের মাঝে, হৈ চৈয়ের মাঝে একটা খালি বেডে শুয়ে পড়েছেন। ডাক্তার সাহেবের সাথে আগে থেকে ঠিক করে রাখা ছিল একটা বিছানা খালি রেখেছিলেন। কেউ টের পায় নি।

তোরা? তোরা— অরু আপা কথা বলতে পারছিলেন না! আমি আবার খুকখুক করে হেসে ফেললাম, রাশেদের একটা স্টেনগান ছিল —

স্টেনগান! রাশেদের? এইটুকুন ছেলে—

মুক্তিবাহিনী রাখতে দিয়েছিল, তাই ব্যবহার করেছে! কোন ক্ষতি তো হয়নি। কয়েকবার গুলি করেছে ভয় দেখানোর জন্যে। আর এরকম অপারেশান তো খালি হাতে করা যায় না! রাজাকারটাকে যখন মাটিতে ফেলা হল—

রাজাকারের সাথে মারপিটও করেছিস?

হ্যাঁ, আমি আর ফজলু গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলেছি—

অরু আপা পুরো ঘটনাটা আবার খুলে বলতে হল। অরু আপা সব কিছু শুনে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোরা? তোরা? এইটুকুন ছেলে এতবড় একটা কাজ করলি? এইটুকুন ছেলে!

আমি বললাম, অরু আপা, এরকম সময়তো আগে কখনো আসেনি। কেউ তো জানে না কি করতে হবে। বড়রাও জানে না, ছোটরা জানে না। তাই আমাদের যেটা ঠিক মনে হয়েছে সেটা করেছি।

অরু আপা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা! বড়দের মত কথা বলা শিখে গেছিস দেখি।

আমি একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, আসলে এটা রাশেদ বলেছিল। রাশেদ সব সময় বড় মানুষের মত কথা বলে। আমাদের এই অপারেশনটার বুদ্ধিটাও রাশেদের মাথা থেকে বের হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ। আমরা খুটিনাটি জিনিসগুলি ঠিক করেছি কিন্তু আসল বুদ্ধিটা রাশেদের। আমরা ভান করব শফিক ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আসলে নিব না। দারুণ বুদ্ধি!

হ্যাঁ, দারুণ বুদ্ধি।

শফিক ভাই পরের দিন সবার সামনে একটা রিক্সা নিয়ে চলে গেছেন। প্রথম রাত শহরেই ছিলেন। পরের দিন নৌকা করে বর্ডারের কাছে একটা হাসপাতালে চলে গেছেন।

অরু আপা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, একটা দেশ মানে কি জানিস ইবু? দেশ মানে হচ্ছে সেই দেশের মানুষ। যে দেশে তোদের মত মানুষ আছে সেই দেশকে কে আটকে রাখবে? বল তুই, কে আটকে রাখবে? কে?

অরু আপা ঠিকই বলেছিলেন। দেশকে কেউ আটকে রাখতে পারেনি। যে যুদ্ধ বছরের পর বছর হবার কথা ছিল সেটা নয় মাসে শেষ হয়ে গেল। দিলীপদের মত এক কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে ইণ্ডিয়াতে চলে গেছে। পথে-ঘাটে, বনে-বাদাড়ে, ক্যাম্পে, একেবারে পশুর মত দিন কাটাচ্ছে। একজব দুজন নয়, এক কোটি মানুষ। পৃথিবীতে বেশির ভাগ দেশে এককোটি মানুষ পর্যন্ত নেই। ইণ্ডিয়া তাদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, কিন্তু কতদিন করবে? শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে এগিয়ে এল। মুক্তিযোদ্ধার পাশাপাশি এল ইণ্ডিয়ার মিলিটারী। ভাবলাম এখন ভয়ংকর যুদ্ধ হবে। কিন্তু কিসের কি! যুদ্ধের কোন নিশানা নেই, এক লক্ষ পাকিস্তান মিলিটারী লেজ গুটিয়ে দুই সপ্তাহের মাঝে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করে ফেলল।

তখন বুঝতে পারি নি, পরে বুঝেছিলাম। নিরীহ মানুষকে গুলী করা খুব সোজা। পাকিস্তান মিলিটারী সেটা খুব ভাল পারে, চোখ বন্ধ করে তিরিশ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলল নয় মাসে। কিন্তু সত্যি সত্যি যুদ্ধ করা এত সোজা নয়। যুদ্ধ করতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস লাগে। এক হচ্ছে সরকার, যে যুদ্ধের পরিকল্পনা করবে। দুই মিলিটারী, যারা গোলা-বারুদ বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ করবে। আর তিন হচ্ছে দেশের মানুষ যারা এই যুদ্ধকে সমর্থন করবে। যে কোন যুদ্ধে এই তিনটা জিনিসই দরকার, এর একটাও যদি কম হয় যুদ্ধ করা যায় না। পাকিস্তান মিলিটারীর প্রথম দুইটা ছিল কিন্তু তিন নম্বরটা ছিল না। সারা দেশের মানুষ ছিল পাকিস্তান মিলিটারী বিপক্ষে, তাই যখন মুক্তিবাহিনীর সাথে ইণ্ডিয়ায় মিলিটারী এগিয়ে এল পাকিস্তানী মিলিটারীরা একেবারে খাটি কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করল। সেটা সম্ভব হয়েছে এই দেশের মানষের জন্যে। যুদ্ধ করুক

আর নাই করুক দেশের সব মানুষ ছিল এক সাথে, সব মানুষ ছিল মুক্তিযোদ্ধা !

ডিসেম্বরের ষোল তারিখ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা গ্রামের বাড়ি থেকে শহরে আমাদের বাসায় ফিরে এলাম। জানুয়ারির শেষে রাস্তাঘাট, ব্রীজ কিছু নেই। পাকিস্তান মিলিটারী যখন দেখেছে তাদের কোন উপায় নেই রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, ব্রীজ সব কিছু ধ্বংস করে গেছে। কাপুরুষের কাজে তাদের সমান আর কেউ নেই।

লঞ্চে করে আমরা যেদিন শহরে পৌঁছলাম, সেদিন জানুয়ারি মাসের উনত্রিশ তারিখ, দুপুর বেলা। আমাদের বাসায় গিয়ে আমরা একেবারে অবাক হয়ে গেলাম, দরজা জানালা আছে কিন্তু ভেতরে কিছু নেই সব কিছু তছনছ করে ফেলেছে। ভিতরে যা আছে সব কিছু ভেঙ্গে চুড়ে লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আম্মা যখন কোমরে আঁচল পেচিয়ে জিনিসপত্র টানাটানি করতে শুরু করছেন আমি তখন এক ছুটে বের হলাম খোঁজ-খবর নিতে। প্রথমে ফজলুর বাসায়, দেখি সেখানে আশরাফও আছে। আমাকে দেখে দুজনে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল, ইবু এসেছে ! ইবু এসেছে !

জাপটা জাপটি করা শেষ হলে আমি বললাম, তোরা ভাল ছিলি ?

হ্যাঁ। বেঁচে থাকা মানেই ভাল থাকা।

রাশেদ, রাশেদ কই ?

আশরাফ আর ফজলু কেমন জানি চমকে উঠল।

একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল, দেখলাম ওদের মুখটা কেমন যেন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে। আশরাফ দুই হাতে আমাকে শক্ত করে ধরে বলল, হায় খোদা ! তুই এখনও জানিস না ?

কি জানি না ?

দুজনের কেউ কোন কথা বলল না, কেমন যেন ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হল কথা বলছিস না কেন ?

তখনো কেউ কথা বলল না।

কি হয়েছে রাশেদের ?

আশরাফ ঢোক গিলে বলল, ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখে ধরা পড়ল বাজারের কাছে। ব্যাগের মাঝে ছয়টা গ্রেনেড ছিল। আজরফ আলী আর রাজাকাররা তখন নদীর ঘাটে নিয়ে দাঁড় করিয়ে— দাঁড় করিয়ে—

আমার হঠাৎ মনে হল আমার হাত পায়ে কোন জোর নেই। আমি পিছিয়ে একটা দেয়াল ধরে বললাম, মেরে ফেলেছে রাশেদকে ? মেরে ফেলেছে ?

আশরাফ হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

আমার ইচ্ছে হল ভয়ংকর একটা চিৎকার করে সারা পৃথিবীকে ভেঙে ধ্বংস করে দিই। হায় খোদা ! তুমি এটা কি করলে ? কি করলে ? তুমি এটা কি করলে ?

শেষ কথা

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। অনেকদিন। অনেক অনেকদিন। না, আমি রাশেদকে ভুলি নি। কখনো ভুলব না। আমি কথা দিয়েছিলাম তাকে ভুলব না— কথা না দিলেও ভুলতাম না। রাশেদের মত একজনকে কি এত সহজে ভোলা যায়?

আমার যখন খুব মন খারাপ হয় তখন আমি রাশেদের সাথে কথা বলি। চোখ বন্ধ করলেই রাশেদ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি বড় হয়ে গেছি কিন্তু রাশেদ বড় হয়নি। এইটুকু ছোটই আছে। রাশেদ যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আমিও তার মত ছোট হয়ে যাই। আমি বলি, এই রাশেদ।

কি হল?

কেমন আছিস তুই?

ভাল।

তোর চুলের এই অবস্থা কেন? মনে হয় পাখির বাসা!

রাশেদ হেসে তার আঙুল দিয়ে চুলগুলি ঠিক করার চেষ্টা করে, কোন লাভ হয় না। আরো বেশি এলোমেলো হয়ে যায়! আমি বললাম, শফিক ভাইয়ের বিয়ে, জানিস?

জানি।

তুই কেমন করে জানিস?

রাশেদ দুলে দুলে হাসে, আমি সব জানি। সব খবর আসে আমার কাছে!

কাকে বিয়ে করছেন জানিস?

হিঃ হিঃ হিঃ! কাকে আবার, অরু আপাকে!

হ্যাঁ, আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন সব সময় অরু আপা কিভাবে আমাকে জ্বালাতন করত জানিস?

কি ভাবে?

বলত আমাকে বিয়ে করবে!

রাশেদ আবার হিঃ হিঃ করে হেসে বলে, এখন গিয়ে জিজ্ঞেস করিস না কেন? হিঃ হিঃ হিঃ—

রাশেদ জানিস অরু আপা আমাকে কি বলেছে?

কি?

বলেছে বিয়ের পর তাদের যখন বাচ্চা হবে যদি ছেলে হয় নাম রাখবে রাশেদ। রাশেদ হাসান।

সত্যি? রাশেদ হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠে, আবার জিজ্ঞেস করে, সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। আমি ভেবেছিলাম আমিও তাই করব।

কি করবি?

আমি যখন বড় হব, আমার যখন বিয়ে হবে, বাচ্চা হবে আমার ছেলের নাম রাখব রাশেদ। কি বলিস?

রাশেদ মিটিমিটি হেসে বলল, তুই আর একটা কাজ কর।

কি কাজ?

তোর বাচ্চার নাম রেখে দিস লাড্ডু!

তারপর রাশেদ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে।

একটু পর আবার আমি তাকে ডাকলাম, এই রাশেদ।

কি?

তোকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?

কি?

তোকে— তোকে যখন গুলী করছিল, তোর কি ব্যথা লেগেছিল?

রাশেদ তখন কেমন জানি চুপ করে যায়। কেমন জানি দুঃখী-দুঃখী লাগতে থাকে তাকে। মাথা নিচু করে বলল, হঁ্যা।

অনেক ব্যথা লেগেছিল, অনেক?

রাশেদ আবার মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, ব্যথা থেকে বড় কি জিনিস জানিস?

কি?

ঠিক যখন বুঝতে পারলাম মরে যাব সে সময়টা। আমার সামনে রাজাকারগুলি দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল তুলে, পিছনে আজরফ আলী, একজন আজরফ আলীকে বলল, হুজুর ছেড়ে দেন, এইটুকু বাচ্চা। আজরফ আলী চিৎকার করে বলল, সাপের বাচ্চা বড় হয়ে সাপই হয়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কলমা পড় — তখন হঠাৎ আমার বুকের ভিতরে যে ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে সেই অনুভূতিটা। মনে হয়, আহা! এই যে পৃথিবী, আকাশ-বাতাস, নদী, গাছ-পালা আর আমি দেখব না। কোনদিন দেখব না।

কোনদিন —

রাশেদ, আমি ধরা গলায় বললাম, আর বলিস না রে। বড় কষ্ট লাগছে।

ঠিক আছে বলব না। রাশেদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু আর যেন কখনো এরকম না হয়, কখনো যেন না হয়।

আমি আস্তে আস্তে বলি, না, হবে না।

রাশেদ তখন আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যেতে থাকে। আমার থেকে মুখ আড়াল করে রেখেছে কিন্তু আমি জানি তার চোখে পানি। অভিমানের পানি। এই পৃথিবীর উপর অভিমান। পৃথিবীর মানুষের উপর অভিমান।

রাশেদ, তুই কাঁদিস না প্লীজ।